বাংলাভাষার বানান সংস্কার

কলিম খান - মঈন চৌধুরী বিতর্ক

সম্পাদনা
শওকত হোসেন

বাংলাভাষার বানান সংস্কার
কলিম খান মঈন চৌধুরী বিতর্ক

গ্রন্থের সূচি

শওকত হোসেন
মূলগ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদকের প্রসঙ্গ-কথা
০৪ – ১৫

কলিম খান
বাংলাভাষার বানান সংস্কার: আগুন ফেলে আঁচ!?
১৬ – ৪৫

মঈন চৌধুরী
বাংলা বানান সংস্কার: আগুন ও আঁচ!
৪৫ – ৫৯

কলিম খান
আনিলাম অপরিচিতের নাম...
৬০ – ৮৯

মঈন চৌধুরী
শুনিলাম পরিচিতের কথা...
৮৯ – ১১২

মূলগ্রন্থে প্রকাশিত সম্পাদকের প্রসঙ্গ-কথা

খ্রিস্টয় সপ্তম শতকের আগে ভাষা হিসেবে 'বাংলা' রূপের আবির্ভাব হয়নি, একথা মোটামুটি সকলেই মেনে নিয়েছেন। যদিও বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানাজনের নানামত রয়েছে। যতদূর দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়ে থাকে, মীননাথই বাংলাভাষার আদিম লেখক।

মীননাথ বাঙালি এবং তিনি দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বাংলাদেশের যোগী সম্প্রদায় নাথপন্থাবলম্বী ছিলেন। একসময় সমস্ত ভারতবর্ষে এই নাথপন্থার বিশেষ প্রভাব ছিল। আদিনাথ শিব; তার পরপরই মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরী, হাড়িপা, কানপা প্রভৃতি সিদ্ধগণ। নাথপন্থার প্রধান ছিলেন নিরঞ্জন বা শূন্য। আর নাথপন্থার আদি প্রচারক মীননাথ। বাঙালির বড় ধরনের গৌরবের বিষয় যে, একজন বাঙালি গোটা ভারতবর্ষকে একটা (ধর্ম?) মত দিয়েছিলেন। এভাবে সমস্ত ভারত এবং বাংলাকে 'বাংলা (দেশ)' তিন যুগে তিনটি '(ধর্ম?) মত' দিয়েছে। প্রাচীন যুগে মীননাথের নাথধর্ম, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম এবং তার পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেবাধর্ম।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র একটি বিখ্যাত উক্তি, 'মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি—এই তিনটিই প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। যে ভাষা ছয় কোটি লোকের কথা-বার্তার, হর্ষ-শোকের, ঘৃণ-ভালোবাসার ভাষা, সে ভাষা হেলার সামগ্রী নয়।' উল্লিখিত উক্তিটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ করেছিলেন '৫৩ সালের দিকে বা তারও আগে; আজ বাংলাভাষায় কথাবলা মানুষের সংখ্যা শুধু বাংলাদেশেই প্রায় পনেরো কোটি, এছাড়া পশ্চিমবাংলার মানুষ তো আছেই। কাজেই বাংলাভাষা হেলার সামগ্রী তো নয়ই বরং ভবিষ্যতে এ ভাষায় কথাবলা মানুষের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকবে সেটা বলা যায়।

ভাষাতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে হিন্দ-ইউরোপিয়ান (Indo-European), শামী (Semitic), হামী (Hamitic), দ্রাবিড় (Dravidian) প্রভৃতি নানাজাতীয় গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে হিন্দ-ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর আর্য-শাখার দারদীয় ও ভারতীয় উপশাখা, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, দাক্ষিণিক (Austric) ভাষাগোষ্ঠীর দাক্ষিণিক-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic) শাখা, চৈনিক (Sanitic) ভাষাগোষ্ঠীর থাই-চীনীয় (Thai-Chinese) শাখা এবং তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর হিমালয়ীন, তিব্বতী, বড়ো, নাগা, কুকী-চীন এবং সক (লুই) শাখা বিদ্যমান আছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ ভাষার ব্যাকরণ, শব্দের ও ক্রিয়ার গঠনপ্রণালী, নিত্যব্যবহার্য শব্দ যথা—সর্বনাম, সংখ্যা, আত্মীয়সূচক শব্দ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবাচক শব্দ প্রভৃতি তুলনা করে একাধিক ভাষাকে একগোষ্ঠী বা তার শাখা কিংবা উপশাখাভুক্ত করেছেন।

পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী প্রাবন্ধিক ও গবেষক কলিম খান ও বাংলাদেশে বসবাসকারী কবি ও প্রাবন্ধিক মঈন চৌধুরী; এ দুজনের বিতর্কের সিরিজলেখা প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত আবহমান পত্রিকায়। সেখানে বাংলাভাষার বানানরীতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কলিম খান ও মঈন চৌধুরী যার যার মত বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এদের কেউই প্রচল

অর্থে ভাষাতত্ত্বের লোক নন। আসলে প্রচল ভাষাতত্ত্ববিদগণ ভাষার তুলনাকালে প্রত্যেক ভাষায় মূলভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বিচার করেন। তারা সকল স্থলে ভাষার প্রাচীনতম রূপ নিয়ে তুলনা করেন। যেমন—"আমাদের বাংলা 'পা' শব্দের সহিত বিভিন্ন ভাষার শব্দগুলির তুলনা এমন—সংস্কৃত পদ্ পদ পাদ, আবেস্তান ও প্রাচীন পারসীক পদ্ পাদ, গ্রীক পোদ্স (সম্বন্ধ পদে), লাতিন পেদিস (সম্বন্ধ পদে), প্রাচীন ইংরেজি ফোট, আধুনিক ইংরেজি ফুট, জার্মান ফুস, ফরাসী পিএ (দ্), স্পানিশ পিএ, পর্তুগীজ পে, ইতালিয়ান পিএ দে, আরমানী হেত্। এই সকল শব্দ একই মূল হিন্দ-ইউরোপিয়ান শব্দ পোদ্ বা পেদ্ হতে উৎপন্ন" (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা)।

জনাব কলিম খান প্রচল পথের ভাষাতাত্ত্বিক নন—কিন্তু তিনি বহুদিন ধরে ভাষা নিয়ে তার ধ্যান ও সাধনাতে সক্রিয় আছেন। কলিম খানের নিজের ভাষায়, 'ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং। তাতে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানীরা কে কে ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা বিষয়ে কী কী বলেছেন, তার বিস্তারিত ও ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিণতি পরপর বিন্যস্ত করে আদি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা কেমন করে ক্রমে ক্রমে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় পরিণত হল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।' [আবহমান ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২০৯]। পক্ষান্তরে জনাব মঈন চৌধুরীও প্রচল অর্থে ভাষাতাত্ত্বিক নন। কিন্তু তিনিও ভাষার দার্শনিক দিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বহুদিন ধরে পাঠ এবং লেখালেখিতে ব্যস্ত আছেন। উল্লেখ্য, আবহমান-এ প্রকাশিত লেখাগুলোতে এই দুই তার্কিক প্রথাগত ভাষাতত্ত্ববিদদের স্বীকার এবং অস্বীকার দুই-ই করেছেন।

মান্যবর কলিম খান ও মান্যবর মঈন চৌধুরী—এ দুজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। কলিম খান পশ্চিমবাংলায় থাকেন বলে তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ কমই ঘটে আর মঈন চৌধুরী ঢাকায় থাকার কারণে তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পরিচালিত বাঙালির চিন্তামূলক রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশনা প্রকল্পের কাজে আমাকে কলকাতা যেতে হয়েছিল দু'হাজার তিন সালের শেষ দিকে; তখন অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ গুণী লেখকদের সঙ্গে দেখা করার পর আরেকজন গুণী লেখকের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম; এদের সকলের কাছে আমাদের প্রয়োজনটা ছিল একই রকম; সেটা হল, এই প্রকল্পের আওতায় প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ছয় হাজার ফর্মা রচনা বিষয়ে তাদের মতামত জানা এবং বিশেষ করে তাদের নিজেদের রচনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা; সেই প্রয়োজনের ধারাবাহিকতায় কলিম খানের বাসায় আমি পৌঁছতে সক্ষম হই কলকাতায় বাসকারী কবি মানসী কীর্তনীয়া'র সহযোগিতা নিয়ে। কলকাতা শহর থেকে কলিম খানের বাসা বেশ দূরে হওয়ায় আমার মধ্যে যে মৃদু অনাগ্রহ এসেছিল, তা দূর করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভারতীতে পাঠরত বাংলাদেশের তরুণ কবি, আলমগীর নিষাদও যাত্রাসঙ্গী হয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছিল। আলমগীর নিষাদ আমার সঙ্গে কলিম খানের বাসার নিচতলা অবধি গিয়েছিল কিন্তু সে কলিম খানের বাসায় ঢোকেনি—কলিম খানের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে তখন টানাপোড়েন চলছিল বলে। কলিম খানের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সামনাসামনি কথা বলা।

এর কয়েক বছর আগে কবি তুষার গায়েন প্রমুখের আমন্ত্রণে কলিম খান ঢাকায় এসেছিলেন, তখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে তুষার গায়েন প্রমুখ আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে কলিম খান প্রধান বক্তা ছিলেন এবং তিনি তার বক্তব্যে যা যা বলেছিলেন বাঙলা, বাঙলা ভাষা ও বাঙলা বানান নিয়ে—তা উপভোগ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেটি ছিল আমার কলিম খানকে কাছ থেকে দেখার প্রথম দিন, সেদিন কথা বলার সুযোগ হয়েছিল না—যেটা সম্ভব হয়েছিল এর প্রায় ৭/৮ বছর বাদে কলিম খানের বাসায় যাওয়ার পর।

তুষার গায়েন প্রমুখ আয়োজিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অডিটোরিয়ামের আলোচনায় কলিম খান ভাষা নিয়ে যা যা বলেছিলেন তার চরম বিরোধিতা করেছিলেন সেখানে উপস্থিত কয়েকজন তরুণ/যুবক; কলিম তাদের কথায় একপর্যায়ে ক্ষেপে গিয়ে প্রায় কান্নার স্বরে যা বলেছিলেন, সেটা এমন, 'আমি ভাবতেও পারিনি, বাংলাদেশে এসে আমাকে এই ব্যবহার পেতে হবে! আমাকে অপমানিত হতে হল বাংলাদেশে এসে!' কলিম সেদিন কী বলেছিলেন আমার হুবহু মনে নেই—তবে এটুকু মনে আছে—কলিম সারাজীবন বাংলাভাষা নিয়ে যে কথাটি বলতে চাইছেন; সেটা কলিমের বহুসংখ্যক লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা মোটামুটি জানেন; কলিম সম্ভবত সে কথাটিই সেদিন তার বক্তৃতায় বলেছিলেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে উপস্থিত দর্শকশ্রোতার উদ্দেশ্যে কী বলেছিলেন জনাব খান? তা অনেকটা পরিষ্কারভাবে আমার বোঝার সুযোগ হয়েছিল দু'হাজার তিন সালে কলিম খানের বাসায় ঘরোয়া ছোট্ট আলোচনা থেকে। অনেক কথার ফাঁকে আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিষয়ের দিক থেকে আপনার লেখা আসলে কোন্ ক্যাটাগরিতে আপনি ফেলবেন? এগুলো কি ভাষাচিন্তার মধ্যে পড়ে? নাকি দর্শনচিন্তার মধ্যে? নাকি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা এগুলো? নাকি রাজনীতি চিন্তার মধ্যে? কলিম খান আমার এসব প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলেন। অধিকাংশ পাঠক জানেন কলিম প্রধানত ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন এবং করছেন কিন্তু কলিম কি শুধুই ভাষা নিয়ে কাজ করে থাকেন? এর জবাব কলিম খান আমাকে সেদিন যেভাবে দিয়েছিলেন, সেটা এরকম, 'একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন চিন্তাকে ক্যাটাগরিক্যালি দেখা হত, যেমন রাজনীতি, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদি। কিন্তু এখন তো একটি বিষয় আরেকটি বিষয়ের মধ্যে ঢুকে একাকার হয়ে যাচ্ছে, একটি লেখা একইসঙ্গে ভাষাচিন্তা, সমাজতাত্ত্বিকচিন্তা, দর্শনচিন্তা ও অন্যান্য চিন্তার হয়ে যাচ্ছে।' আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, কলিম খান নিজের লেখাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে ফেলতে চাচ্ছেন না, বা আগ্রহী নন। অথবা তিনি নিজের একই রচনাকে একাধিক বিষয়ের মনে করেন।

বাংলাদেশের ষাটের দশকের অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা কণ্ঠস্বর-এর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সাম্প্রতিক সময়ের সম্পাদিত শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা আবহমান-এ প্রকাশের লক্ষ্যে কলিম খানের একটি প্রবন্ধ কীভাবে পাওয়া যায়—এ ব্যাপারে আমি কবি তুষার গায়েনের সহযোগিতা চাই; এই পত্রিকার লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব আমার, আর কলিম খানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তুষার গায়েনের—এই দু'কারণের সঙ্গে আরেকটি বিষয় হল তুষার গায়েনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ নয়—ফলে কলিম খানের একটি রচনা আবহমান-এ প্রকাশের জন্য পেয়ে যাই। লেখাটির শিরোনাম বাংলাভাষার বানান সংস্কার :

আগুন ফেলে আঁচ?! বত্রিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ এই লেখাটি প্রকাশিত হয় আবহমান-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়। যার একটি দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া লেখেন জনাব মঈন চৌধুরী, এর পরের সংখ্যাতেই।

বাংলাদেশে 'ফুকো' 'দেরিদা' ইত্যাকার শব্দগুলো প্রথম আমাদের সামনে যে দু'একজন ব্যক্তি তুলে ধরেন মঈন চৌধুরী হলেন তাদের একজন। বাংলাদেশে দর্শনকে একাডেমীর বাইরে থেকে চর্চা করার সাহস দেখান যারা মঈন চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। মঈন চৌধুরীর এই প্রতিক্রিয়ায় কলিম খানের সঙ্গে তার অনেক ক্ষেত্রে মতভেদ লক্ষণীয়। প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা বানান সংস্কার : আগুন ও আঁচ শিরোনামে।

শুরু হল কলিম খান ও মঈন চৌধুরীর মধ্যকার কাজিয়া। একে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া বলা যাবে না, এই কারণে যে, দুজন দুপাড়ের মানুষ হলেও দুজনই মুসলিম পরিবারের সন্তান। একে দুই বাংলার ঝগড়াও বলা যাবে না, এই কারণে যে, এদের লেখা সেটা প্রমাণ করে না। আর 'কলিম খান' এমন একটি নাম; যাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই, একইভাবে 'মঈন চৌধুরী'কেও পরিচয় করিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। বরং আমি শওকত হোসেন, নিছক কবিতার মানুষ হয়ে, এই তাত্ত্বিক পণ্ডিত দুই ব্যক্তির কাজিয়া বা বিতর্কসম্মত লেখাগুলো নিয়ে একটি বই সম্পাদনা করার যোগ্যতা রাখি কি-না, সেটা কেউ কেউ ভেবে বসতে পারেন; যারা এরূপটি ভাববেন, তাদের জন্য আমার জবাব হল, আবহমান পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে আমার মনে হয়েছে এই দুই পণ্ডিতের লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন পাঠকের চাহিদার কারণে, যে চাহিদার বাস্তব অবস্থা আমি অনুধাবন করেছি ঐ আবহমান-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই। আরও একটি কারণ রয়েছে এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে, তা হল আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় কলিম খান যে লেখাটি লিখলেন, মঈন চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়া দিলেন ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়, পুনরায় কলিম খান মঈন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দিলেন আবহমান-এর ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মঈন চৌধুরী, কলিম খানের সর্বশেষ ঐ প্রতিক্রিয়ার আরও একটি প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন, যেটি আবহমান-এর সম্পাদক ছাপতে রাজি হননি। কেন রাজি হননি সেটি আবহমান-এর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে আমার জানা থাকার কথা; কিন্তু আমিও জানি না কেন সেটি সম্পাদক মহোদয় ছাপলেন না। সে যে-কারণেই হোক, কথা হল, বাংলাভাষার বানান সংস্কার নিয়ে সময়োপযোগী এ-ধরনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য আবহমান-এর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আবহমান-এ কলিম খানের মূল লেখাটি এবং একটি প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তার মোট দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মঈন চৌধুরীর শুধুমাত্র একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে; তার আরেকটি প্রতিক্রিয়া, যেটি আবহমান-এ ছাপা হয়নি, সেটিও এই বইয়ে ছাপা হল; যুক্তি-তর্ক বা কাজিয়ার দিক থেকে এই প্রকাশনাটি তাতে পূর্ণাঙ্গতা পেল। আমি মনে করি এখানে আমার ভূমিকা খুবই গৌণ; আমার কাজ শুধুমাত্র দুজনের তর্কের পরিবেশটা তুলে ধরা, পুরো লেখার সূত্রটা আগ্রহী পাঠককে ধরিয়ে দেয়া।

জনাব কলিম খান, কী লিখেছিলেন আবহমান পত্রিকার ১ম বর্ষ ২ সংখ্যায়? তার মূল প্রবন্ধে? লিখেছিলেন বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ!? প্রবন্ধটি; অত্যন্ত ঝরঝরে ভাষায় লেখা এই রচনাটি ৭ (সাত)টি অংশে বিভক্ত—১. আটকাচ্ছে কোথায়? ২.

বাংলা বানানের সমতাবিধান করতে গেলে আটকাচ্ছে কোথায়? ৩. বাংলাভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাচ্ছে না কেন? ৪. ভাষা-সংস্কার নিয়ে কাজিয়ার মূলে কী রয়েছে? ৫. কী আছে বিধাতার মনে! ৬. এখন তা হলে কী করি! এবং ৭. টীকা ও টুকিটাকি। বোঝা যাচ্ছে, অন্তত আন্দাজ করা যাচ্ছে কিছুটা হলেও এই শিরোনামগুলো থেকে যে, রচনাটি প্রথমত ভাষা বিষয়ে, দ্বিতীয়ত ভাষার বানান বিষয়ে, তৃতীয়ত বানানের সংস্কার ও সমতাবিধান বিষয়ে এবং চতুর্থত ভাষার দর্শন বিষয়ে রচিত। প্রবন্ধটিতে উঠে এসেছে এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তার 'শব্দতত্ত্ব' বইয়ে—সে কথা, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এ নিয়ে কী করতে চায়—সেকথা এবং বাংলাদেশের বাংলাভাষাচর্চাকারী বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা কী, সেটাও। তবে রচনাটি যেহেতু খোদ কলিম খানের, এইসব অবলোকনও পণ্ডিত কলিম খানের একান্ত নিজের।

গত ০২.৭.২০০৪ তারিখে জনাব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় আমাদের হুস্‌সি দীর্ঘি শিরোনামে। কলিম খান নিজের প্রবন্ধের বেশ খানিকটা পথ অগ্রসর হয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বিমত ও সহমত পোষণের মধ্য দিয়ে; প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে কলিম খান কেন সুনীলকে বেছে নিলেন? বোধ করি যে জন্য বেছে নিলেন সেটা কলিমের স্বীকারোক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে, 'এক বিশালসংখ্যক বাঙালির প্রতিনিধিত্ব আছে তাঁর (সুনীলের) স্বরে। তিনি (সুনীল) আজকের পশ্চিমবাংলার কবি-সাহিত্যিকদের শিখরে বাস করেন। তাঁর (সুনীলের) কথার মূল্য জনসাধারণে অত্যন্ত প্রবল। সর্বোপরি রয়েছে অনেকের ভরসাযোগ্য তাঁর (সুনীলের) কবিমানসটির বিবেক।' ফলে যারা এতকাল মনে করে আসছিলেন যে, জনাব কলিম খান অনেকটাই প্রতিষ্ঠানবিরোধী কিংবা প্রতিষ্ঠানবিদ্বেষী; তাদের ধারণায় খানিকটা চির ধরতে পারে সুনীলের মতো পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের পোষ্য-মহান-বড়-জনপ্রিয় অভাষাতাত্ত্বিকের প্রতি কলিমের এই গুরুত্ব প্রদান দেখে।

অনেকেই, এমনকি অনেক ভাষাতাত্ত্বিকও, মনে করেন কলিম খান ভাষাতত্ত্বের বাজারচলতি ফর্মকে স্বীকার করেন না; পাঠক একথা আরও বেশি করে মেনে নেবেন, যদি কলিমের আলোচ্য প্রবন্ধটি তারা পাঠ করেন। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে—এরপর প্রবন্ধটি ধীরে ধীরে এগিয়েছে যেভাবে এবং এগুতে এগুতে একসময় সমাপ্ত হয়েছে যেভাবে, তাতে বাংলাভাষার চিরায়ত যে ফর্ম (রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত) তার উল্টো দিকে ঝুঁকে আছে কলিমের অবস্থান। বিভিন্ন যুক্তি হাজির করে কলিম মূলত ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ইঙ্গিত প্রদান করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনাব কলিম খানের দীর্ঘ গবেষণার রেশ : শব্দের বানান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থের বিস্তার ঘটে যেভাবে সেই রীতিটি। এখানে জনাব কলিম খানের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য :

ক. এমতাবস্থায় আমরা কী করব? আমরা কি বানানের সমতাবিধায়কদের এই দাবি মেনে নেব? পুনরায় রবীন্দ্রনাথের মতো উভয় কূল রক্ষা করার চেষ্টা করব? নাকি অন্য কোনো উপায় আছে কি না, সেটি অনুসন্ধান কবে দেখব? কী করব আমরা?

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের সময়ের সঙ্গে আমাদের সময়ের বিস্তর ফারাক ঘটে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাভাষা এখন কার্যত দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—বিশেষ্যভিত্তিক (লেগোসেন্ট্রিক) বাংলাভাষা ও ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষা। যে-

বাংলাভাষায় এখন বাঙালিরা কথাবার্তা বলেন, যে-বাংলা এখন বাঙালির কাজের ভাষা, যার ব্যাকরণ এখনও লেখা হয়নি, যার প্রায় সমস্ত শব্দই ইংরেজি শব্দের মতো বিশেষ্যভিত্তিক শব্দার্থবিধি মেনে চলে, যার হাতে জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজকের অজস্র খ্যাত-অখ্যাত প্রান্তিক লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের বিশাল সাহিত্যসম্ভার রয়েছে এবং যা পুষ্পে-পল্লবে প্রত্যহ আরও বিকশিত হচ্ছে, সেটিই বিশেষ্যভিত্তিক বাংলা। আর, যে-বাংলাভাষায় এখন প্রায় কোনো বাঙালি কথাবার্তা বলেন না, যে-বাংলা এখনকার বাঙালির কাজের ভাষা নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণই যার ব্যাকরণরূপে প্রচলিত রয়েছে, যার বেশির ভাগ শব্দই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মেনে চলে, যার হাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাশী মহাভারত নামে দুইখানি মহাকাব্য রয়েছে, রয়েছে বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের সম্ভার, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের হাতে লালিত পালিত পদাবলী সাহিত্য ও পদমঞ্জুষাদি, আর রয়েছে অনূদিত বেদপুরাণাদির বিশাল সম্ভার, যেগুলির প্রতি একালের 'আধুনিক' বাংলাভাষাচর্চাকারীদের চরম অবহেলার ফলে এবং ঐতিহ্যবাদীদের মিথ্যা বাগাড়ম্বরের কারণে যার অধিকাংশ অর্থই আমরা ভুলে গেছি, সেটিই ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষা। [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪৫-৪৬]।

খ. আমার তো সেই রবীন্দ্রনাথের সমস্যাই হয়ে গেল—ফেলতে গেলে লাগে, রাখতে গেলে বাজে। [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪৭]।

এছাড়া রচনাটিতে বেশ মোটাদাগে কলিম তুলে ধরেছেন সফল, 'স্পেস-চেক' সফটঅয়ার বানাতে হলে বানানের সমতাবিধান করা কতটা জরুরি, সে বিষয়টি। আর বানানের সমতাবিধান করতে হলে বানান সংস্কার কতটা জরুরি সে বিষয়টিও। কলিম খান তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হাজির করে বলেছেন, কম্পিউটারে সফল 'স্পেল-চেক'-এর ব্যবস্থা না থাকার দরুন আমাদের সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। কলিম খান বাংলাভাষায় 'স্পেল-চেক'-এর ব্যবস্থা না থাকার কারণে যেমন বাস্তব কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষাকে তুলনা করেছেন এভাবে :

ক. পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় শব্দের বর্ণেরা (ধ্বনিরা) মানে ধারণ করে না। এটিই বিশ্বের সমস্ত ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলাভাষার মূল ও প্রধান পার্থক্য। ফলে, অন্য যে- কোনো ভাষায় একটি শব্দ থেকে একটি বা দুটি বর্ণ বাদ দিলে, বা নতুন এক-দুটি বর্ণ জুড়ে দিলে শব্দের মানে বদলায় না। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলা ভাষায়, অর্থাৎ তৎসম শব্দের বেলায় সেরকম করলেই মানে বদলে যায়। যেমন ইংরেজরা আগে লিখতেন cometh, এখন লেখেন come, কোনো অসুবিধে হয়নি। অভিবাসিত মার্কিনরা তো colour-কে color, programme-কে program, এরকম বহু বদল করে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের মৎস্য, আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের 'য়'-ফলা বাদ দিয়ে দিলে মানে বদলে যাবে। এমতাবস্থায়, 'বাংলা বর্ণ মাত্রেই অর্থ ধারণ করে'—এই কথা যাঁরা জানেন না, তাঁরাই বসেছেন বানানের সমতাবিধান করতে। বাংলা শব্দের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ যে-সেকেলে লোহার সিন্দুকটিতে রেখে দিয়ে শাশুড়ি মহাশয়া তার চাবিটাই হারিয়ে ফেলেছেন, ঘর সাফ-সুতরো (রিনোভেশন) করতে গিয়ে

সেই সিন্দুকটাকেই এরা ফেলে দিতে চলেছে! ভাবা যায়! [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৪৮-৪৯]।

খ. তাই সে সমস্ত শব্দের একটি বর্ণকে বাদ দিলে, বর্ণটি যে-অর্থকে ধারণ করে রেখেছিল, সেটি বাদ পড়ে যাবে। এইজন্য ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার শব্দের বানান বদলানো যাবে না। এক্ষেত্রে সংস্কৃত বানান অনুসরণই আদর্শ। অন্যদিকে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় শব্দের বানান বদল করলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩]।

এরপর কলিম খানের নিচের উদ্ধৃতি দুটি পাঠ করলে আমাদের বুঝতে আর সমস্যা থাকে না যে, কলিম খান আসলে পুরো প্রবন্ধে কী বলতে চেয়েছেন এবং কেন বলতে চেয়েছেন :
ক. এক শব্দের এক অর্থ থাকা ভাষার লোকাল-স্বভাব, আর এক শব্দের বহু অর্থ থাকা ভাষার গ্লোবাল-স্বভাব। আজকের দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই লোকাল-স্বভাবের, আমাদের বাংলাভাষার লোকাল-স্বভাব ও গ্লোবাল দুটোই রয়েছে। [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩]।

খ. প্রাথমিক স্তরের বাংলায় আমরা লোকালের সাধনা করব, লোকালাইজেশনের সাধনা করব, উচ্চতর স্তরের বাংলায় আমরা গ্লোবালের সাধনা করব, গ্লোবালাইজেশনের সাধনা করব। [আবহমান ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩]।

আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় জনাব মঈন চৌধুরী, কলিম খানের 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ?!' রচনাটির প্রতিক্রিয়া লেখেন 'বাংলা বানান সংস্কার : আগুন ও আঁচ' শিরোনামে। প্রতিক্রিয়ার শুরুতেই মঈন চৌধুরী আমাদের জানিয়ে দেন 'কলিম খান আমার প্রিয় প্রবন্ধকারদের মাঝে একজন এবং তার যে-কোনো বক্তব্যকে আমি শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করি। কলিম খানের প্রবন্ধের ভাষা আমাকে মোহমুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে।' এরপর তিনি ধীরে ধীরে ও কখনো দ্রুত কলিমের বিভিন্ন মতের পক্ষে ও বিপক্ষে মত ব্যক্ত করতে থাকেন।

মঈন চৌধুরী কলিম খানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বর্তমানে দেশকাল-গ্রাহ্য বিষয়-আশয় বাদ দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি রামায়ণ, মহাভারত, মক্কা, মদিনায় আর আমাদের Paradigm-এ ঘুরছে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, বাদরায়ণ, মন মিশ্র, নাগেশ ভট্ট, ফ্রেগে, সস্যুর, চমস্কি, লেভি-স্ট্রাউস, কম্পিউটার স্পেল-চেক ইত্যাদি ইত্যাদির মতো বিষয়।' এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে যে তীব্রভাবে কলিমের মতের বিরোধিতা রয়েছে সেটা কলিমের মূল প্রবন্ধটি যাদের পড়া থাকবে, তাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কলিম খানের 'বাংলাদেশের উর্দু-আরবি আতরসিঞ্চিত নেক বাংলাভাষা' নিয়ে মঈন চৌধুরী বিরোধিতা করে বলেছেন, 'বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর প্রভাবে ও আতরসিঞ্চনে বাংলাদেশের বঙ্গালদের ভাষা পবিত্র কিংবা নেক হয়ে গেছে। দু-একজন কবি-প্রাবন্ধিক-পণ্ডিত বাংলাদেশের বাংলাতে বেশকিছু আরবি-ফারসি ভেজাল আনতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা 'আতর' না হয়ে 'ভেজাল' হিসেবেই গণ্য হয়েছে।' [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃ. ১০০]।

এভাবে জনাব কলিমের একটা একটা প্রসঙ্গ টেনে জনাব মঈন তার এমন বিরোধীযুক্তি হাজির করেন, যার শিকার হতে হয় পাঠককে; ব্যক্তিগতভাবে আমি যেমনটি অনুভব করেছি; যখন কলিম খানের যুক্তির মুখোমুখি হই তখন মনে হয়—হ্যাঁ তাই তো! আবার মঈন চৌধুরীর বিরোধী যুক্তির মুখোমুখি হয়ে মনে হয়েছে ঠিকই তো! কিন্তু পাঠক যদি এ-দুজনের মোটিভ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেন, তা হলে এই তর্কের ভেদ সম্পর্কেও পরিষ্কার হতে পারবেন; পৃথিবীর যে-কোনো সৎতর্কের মধ্যেই এক ধরনের উত্তেজনা থাকে; কলিম-মঈনের তর্কের এই উষ্ণতা ও উত্তেজনা এটাই প্রমাণ দেয় যে, এদের উভয়ের আলাদা পক্ষ অবলম্বনের ভেতর সেই গভীর সৎ অনুভূতি রয়েছে; যা তর্ককে বেগবান রেখেছে।

বাংলাভাষার বানানসমতা বিধানের ক্ষেত্রে কলিমের 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ', 'সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দে'র প্রসঙ্গ টেনে আনাকে অর্থহীন বিবেচনা জ্ঞান করে মঈন চৌধুরী জানান, 'বাংলা বানানের সমতাবিধানের জন্য বাংলা শব্দ হিসেবেই কোনো কোনো শব্দের বানান নতুনভাবে লেখা যেতে পারে, কিন্তু এই সমতাবিধান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের প্রসঙ্গ টানা যাবে না।' [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১০১]। উল্লিখিত বিরোধিতা যে-কেউ করতে পারেন, কিন্তু আমার ধারণা এমন সরাসরি বক্তব্য জনাব মঈন খুব একটা ভেবেচিন্তে করেননি; কেননা 'সমতাবিধান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের প্রসঙ্গ টানা যাবে না' এমন উক্তি পাঠককে আহত করবে, এজন্য যে, মঈন তার সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় নিজেই স্বীকার করেছেন সংস্কৃত এবং তৎসম শব্দের অবদানের কথা। এবং আমার ব্যক্তিগত ও অন্যান্য পাঠকের পর্যবেক্ষণ, মঈনের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই যাবে।

কলিম খান তার প্রবন্ধে বলেছেন, "বাংলাভাষা যদি 'বউমা' হয় তবে 'সংস্কৃত' আসলেই তার শাশুড়ি।' যে-কথার তীব্র বিরোধিতা করে মঈন চৌধুরী বলেছেন, "আমার তো মনে হয় 'সংস্কৃত' বাংলা 'বউমা'র শাশুড়ির মাসির শাশুড়ির মতো সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করছে।" একই জায়গাতে এরপর মঈন চৌধুরী বেশ পরিষ্কার করে বলেন, 'বাংলাভাষায় শতকরা সত্তরটি তদ্ভব, দশটি তৎসম, পাঁচটি অর্ধ-তৎসম, পাঁচটি খাঁটি দেশজ, আটটি বিদেশি ভাষার ও দুটি অজ্ঞাতমূল ভাষার শব্দ রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, "চলতি বাংলাভাষায় তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য একথাই প্রমাণ করে যে বাংলাভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বিবর্তনে বর্তমান রূপ নিয়েছে। ভাষার প্রত্ন-ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত ছিল এক স্থবির ও গতিহীন ভাষা, যা থেকে নতুন কোনো ভাষার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।' [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১০৩]। মূলত মঈন চৌধুরী তার দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ায় বহু কথার ভেতর দিয়ে যে কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন, তার সারকথা বলা যায় উপরিউক্ত উদ্ধৃতিকে। এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন জনাব কলিম খান লিখিত প্রবন্ধের যে মত ও চিন্তা তার বিপরীতে। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষার নিকট-আত্মীয় হল 'প্রাকৃত', 'সংস্কৃত' নয় বলেও মত প্রকাশ করেছেন মঈন চৌধুরী। তবে এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ভাষাবিদগণ কী বলেছেন সেটা একনজরে দেখে নেয়া যেতে পারে :

হেমচন্দ্র প্রমুখ সংস্কৃত পন্থিহি, কাজ দীন মুহম্মদ প্রমুখ প্রায় একমত যে বাংলাভাষা সংস্কৃত কিংবা মাগধী প্রাকৃত থেকে আসেনি, বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের মাধ্যমে। [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১০৪]।

অবশ্য ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথনিয়েল ব্রাসসে হালহেড বাংলাভাষা সম্পর্কে বলেন, 'What the pure Hindastanic is to upper India, the language which I have here endeavoured to explain is to Bengal, intimately related to Shanscrit both in expression, construction and character. It is the sole channel of personal and epistolary communication among the Hindoos of every occupation and tribe.' [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১০৫]। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, হয়তো-বা তার এই ধারণা হয়েছিল সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাথে হালহেডের কথাবার্তা ও চলাফেরা করার ফলে।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সুনীল বলেছিলেন, 'সব শব্দই এক একটি ছবি আনে আমাদের মানসে'—সেখানে কলিম তার প্রবন্ধে যা বলেছেন সেটা এমন যে, আমাদের মানসে কোনো শব্দ শুধুমাত্র ছবি আনে না, বরং আমরা তখন 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী দেখি।' মঈন চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় জনাব সুনীল ও মান্যবর কলিমের মত নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, 'ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো অর্থ নেই, যদি-না তা একটি দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত হয়।' এরপর মঈন চৌধুরী বলতে চেয়েছেন, যে অন্ধব্যক্তি কোনোদিন আকাশ দেখেনি তার কাছে আকাশ কোনো দৃশ্যকে হাজির করবে না।

বাংলাভাষার চর্চার ক্ষেত্রে একপর্যায়ে মঈন চৌধুরী বলেছেন, 'সর্বভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির অংশ হয়ে, এখন পশ্চিমবঙ্গে চলছে ইংরেজি আর হিন্দি শেখার প্রতিযোগিতা।' পক্ষান্তরে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, 'বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাংলাদেশের ওপর।' মঈন চৌধুরী তার ১ম প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ স্তবকে বলেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস', এই বাক্যের সাথে আমি একমত নই। বাংলাভাষী বঙ্গাল মুসলমানের ঐতিহ্য-ইতিহাসও মক্কা-মদিনায় নয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী জনগণের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে।" [আবহমান ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১১১]।

কলিম খান লিখিত প্রবন্ধের যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মঈন চৌধুরী, সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কলিম খান আবহমান ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় লিখেছেন, 'সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমার নিবন্ধটিতে তিনি (মঈন চৌধুরী) এমন কিছুই পাননি, যার একটুখানি প্রশংসা করা যায়!'

একজন পাঠক হিসেবে, গ্রন্থটির সম্পাদক হিসেবে এবং সর্বোপরি আবহমান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অজুহাতে উপরে উল্লিখিত কলিম খানের দুঃখ দেখে আমারও দুঃখ হয়, এই জন্যে যে, কলিম খানের দেয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিজেই মঈন চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন যা মঈনকৃত কলিমের প্রশংসা বই কিছু না; উদ্ধৃতিটি হল, 'বাংলাভাষার বানানে যে সমস্যা রয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে... বাংলা বানানের সমতাবিধান করা নিতান্তই প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে কলিম খান-এর সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই।' আমি মনে করি, যে-কেউ মনে করবে এবং মনে করাই সঙ্গত হবে যে, কলিম খানের সাথে মঈনের দ্বিমত নেই—এই কথার ভেতরেই নিহিত আছে মঈনকৃত কলিমের সঙ্গে সহমত প্রকাশ, যাকে প্রশংসা নামে অভিহিত করা ভালো।

তবে কীভাবে বাংলা বানানের সমতাবিধান করা যাবে, সে প্রশ্নে মঈনের মতামত নিশ্চয়ই সহাবস্থান তো নয়ই বরং একে বিপরীত অবস্থা বলা সঙ্গত। উল্লেখ্য মঈন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়ার

জবাব দিতে গিয়ে কলিম খানও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহমত প্রকাশ করেছেন। যেমন, মঈন যে বলেছিলেন কলকাতার বাংলাচর্চার দুরবস্থার কথা, কলিম খান সেই বক্তব্যেরই পক্ষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন এভাবে, 'অদূর ভবিষ্যতে হয়তো-বা বাংলাদেশই আমাদের পঞ্চভুবনের, পাঁচ ভাইয়ের মিছিলের সামনে বাংলাভাষার পতাকাটি হাতে নিয়ে চলবে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বাংলাভাষাচর্চার বর্তমান দুরবস্থা, অন্য ভুবনগুলোর ওপর আমাদের অযোগ্য অ্যাকাডেমিশিয়ান ও কবি-সাহিত্যিকদের 'দাদাগিরি' এবং বাংলাদেশে সেই চর্চার তুলনামূলক অগ্রগতি অর্জনের ও যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা থেকেও সেরকম ইঙ্গিত মেলে।' কিন্তু একইসঙ্গে কলিম বলেন, 'তবে, যতদূর বুঝতে পারি, এখনও বাংলাভাষার পতাকাটি, হেলে-পড়া সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্লান্ত-অবসন্ন কাঁধেই বাহিত হচ্ছে।' জনাব খান এখানেই কথা শেষ না করে একটু পরে আবার বলেন, "হয়তো বাংলাভাষার মহিমার পূর্ণ অধিকারী সে (বাংলাদেশ) এখনও হতে পারেনি, হতে পারলে দেখা যাবে বাংলাদেশই 'বাংলাভাষা-সংসার'-এর কর্তা হয়ে গেছে; বাংলাভাষার পতাকাটি তার (বাংলাদেশের) কাঁধেই শোভা পাচ্ছে।" [আবহমান ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৯৫-১৯৬]।

কলিম খান সবচেয়ে 'কঠিন কথা' বলে মঈন চৌধুরীর একটি মন্তব্যকে অভিহিত করেছেন। মঈনের আরেকটি মন্তব্যকে সেই কঠিনতম কথার ঠিক আগের কথাটি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। দেখা যাক মঈন চৌধুরীর সেই কঠিনতম ও তার আগের কঠিনতর কথা কী; কলিমের মতে মঈনের কঠিনতর কথাটি হল, "সবশেষে একটা কথা বলি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথার বিপরীতে মঈন চৌধুরী যে তার মত প্রকাশ করেছেন সেটা কলিম খানেরও মতের বিপক্ষে চলে যাওয়ায় কলিম খান এ-ব্যাপারে মঈনের অবস্থানকে বলেছেন কঠিনতম কথার আগের কথা। তা হলে কঠিনতম কথাটি কী; কলিমের মতে মঈনের কঠিনতম কথাটি লুকিয়ে আছে যে কথার ভেতর সেটি হল : 'বাংলাভাষী বঙ্গাল মুসলমানদের ঐতিহ্য-ইতিহাসও মক্কা-মদিনায় নয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী জনগণের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বঙ্গ, উপবঙ্গ, বরেন্দ্র নামের বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে। আমাদের শেকড় খুঁজতে ভাষা ও সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ আরও জোরে চালাতে হবে বৈকি।'

মঈনের এই কঠিনতম মতের কঠিনতম জবাব কলিম কীভাবে দিলেন? কলিম খান আমাদের জানান যে, মঈন চৌধুরী কঠিনতম কথাটি স্পষ্ট করে বলেননি; জনাব খানের অনুমান, সেটি হয়তো এরকম, 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার (রামায়ণ, মহাভারত) ফেলে দিতে হবে।' কিন্তু মঈন চৌধুরী এই জ্ঞানভাণ্ডার (রামায়ণ, মহাভারত) প্রকৃতপক্ষেই ফেলে দিতে যে চাননি—এটি স্বাভাবিক পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, যদি সবগুলো লেখা সেই পাঠক পাঠ করেন। তা সত্ত্বেও মঈন চৌধুরীর না-বলা এই কথাটি নিজের অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলে দিয়ে, কলিম খান মূলত মঈন চৌধুরীর কঠিনতম কথাটিরই জবাব দিয়ে দিলেন। যে লেখক বা গবেষক রামায়ণ, মহাভারতকে ফেলে দেয়ার কথা বলবেন, সে লেখক বা গবেষককে কীভাবে দেখব আমরা, বলা বাহুল্য যে, মোটেও ভালোভাবে দেখব না। কিন্তু কতটা মন্দভাবে দেখব; সেটাও বলা বাহুল্য যে, আমরা বিষয়টিকে সর্বাত্মক খারাপ বা মন্দভাবে দেখব। তা হলে কলিম খান যে বললেন, মঈন চৌধুরী বলেছেন, 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার ফেলে দিতে হবে।' এই কঠিনতম'র চেয়েও

কঠিনতম কলিমের পর্যবেক্ষণটি মঈন চৌধুরী কীভাবে নেবেন? কেননা আমি যদি মঈনের কথা বুঝে থাকি, তাতে আমার অন্তত মনে হয়নি জনাব মঈন এ ধরনের কোনো কথা বলেছেন। মঈন চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণের পার্থক্যের কথা; আসলে তিনি যা বলতে চান তাতে বোঝায় যে, 'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এর জবাবে কলিম খান লিখলেন, "কী উত্তর দেব তাকে? বড়জোর বলতে পারি—চলে যান মহারাষ্ট্রে মহীশূরে। যে-কোনো শিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলুন। নিজের কানে শুনেই বুঝতে পারবেন 'ন' আর 'ণ' এর উচ্চারণের পার্থক্য কী।" 'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণগত পার্থক্য বুঝবার জন্য কলিম খান মঈন চৌধুরীকে মহারাষ্ট্র আর মহীশূরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন; জবাবে মঈন চৌধুরী তার সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, "আমি 'ন' আর 'ণ'-এর উচ্চারণ বুঝতে মহারাষ্ট্র আর মহীশূরে যাব কেন! আমার খুব প্রয়োজন হলে আমি বড়জোর কলকাতা যেতে পারি এবং আমি জানি সেখানে গিয়ে আমি 'স', 'শ' আর 'ষ' নিয়ে আরও ব্যাপক বিভ্রান্তিতে পড়ব, 'ন' আর 'ণ' নিয়ে আমার যে কিছু প্রবলেম আছে, তার সমাধান পাব না।"

মঈন চৌধুরীর বক্তব্যের একটি প্রসঙ্গ টেনে কলিম খান (প্রায় রাগ করেই হয়তো) বলেন, 'মান্যবর মঈন চৌধুরী তো ভাষাটিকে একজন ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখছেন না। দেখছেন এমন একজন মুসলমান হিসেবে, যিনি বিশ্বাস করেন সংস্কৃত হল হিন্দুদের ভাষা, ব্রাহ্মণদের ভাষা।' কথা হল, মঈন চৌধুরী যদি সেভাবেই চিন্তা করে থাকবেন তা হলে মঈন চৌধুরী নিজেই কী করে বলেন, 'বাংলাভাষা বঙ্গাল মুসলমানদের ঐতিহ্য-ইতিহাস, মক্কা-মদিনায় নয়।' বরং তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে।' কাজেই 'সংস্কৃত হল হিন্দুদের ভাষা' মঈন চৌধুরী এই কথা বলেছেন বা ভেবেছেন বা ভাবতে পারেন এমনটি অন্তত আমি মনে বা মেনে নিতে পারছি না। মঈন চৌধুরী তার সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় দুটি ছক এঁকে বলেছেন, 'কোনো স্পেল-চেক সফটঅয়ার বাংলাভাষায় বানানো যায় না, এমন নয়। বানানো যায়।' যার জবাবে কলিম খান লিখেছেন, 'মান্যবর মঈন চৌধুরী একজন প্রকৌশল-বিজ্ঞানী। কম্পিউটারের বিষয়ে তিনি অনেক জানবেন সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ছবি এঁকে বোঝানোর অধিকার তাঁর আছে।' [আবহমান ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২১৯-২২০।

কলিম খান তার ২য় বারের লেখায় অর্থাৎ মঈন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়ার জবাবে এরূপ ব্যক্তিগত কিছু শ্লেষ ও আক্রমণের মতো করেছেন; দেখা যাচ্ছে মঈন চৌধুরীও তার ২য় বারের প্রতিক্রিয়ায় অর্থাৎ কলিম খানের প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কিছুটা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে দিয়েছেন। কী জানি! সৃষ্টিশীল মানুষদের আঘাত-পাল্টাঘাত হয়তো এমনই হয়ে থাকে! অবশ্য মঈন চৌধুরীর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার কিছু জায়গায় তিনি কলিম খানের সঙ্গে সহমতও ব্যক্ত করেছেন, কোথাও কোনো ভুল বোঝার বিষয় ঘটলে তার জন্য ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছেন।

কলিম খান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে, মান্যবর মঈন চৌধুরী প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের কথা বলেছেন কিন্তু কীভাবে খনন করতে হবে তা পরিষ্কার করে কিছু বলেননি; জনাব কলিমের এই বক্তব্যের জবাবে জনাব মঈন বলেন, 'আমি কিন্তু আমার বক্তব্যে বঙ্গদেশের আদি জনপদগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার কথাই বলেছিলাম।' তবে অনেক

কাজিয়ার পর মঈন চৌধুরী কিন্তু তাঁর শেষ প্রতিক্রিয়ায় 'সংস্কৃত' বিষয়ে নিজের মতকে পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন এভাবে, 'বাংলাভাষার উন্নয়নের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি ঋণী সংস্কৃতভাষার কাছে, কারণ সংস্কৃতভাষার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মূলশব্দ বা অপভ্রংশ বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাভাষার উপাদান হিসেবেই।' কলিম খান আনীত 'বাংলা স্পেল-চেক' প্রসঙ্গে মঈন চৌধুরী তার সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মাত্র ১৫/২০ বছরে বাংলাডিটিপি যতটা এগিয়েছে, তাতে আমি আশাবাদী এবং আমি ভাবতে পারি আগামী ২/৩ বছরের মাঝে আমরা একটি ভালো স্পেল-চেক সফটঅয়ার পেয়ে যাব, আমাদের লোকসানও কমে যাবে।' সব মিলিয়ে আমরা লক্ষ করব যে, কলিম খানের দুটি লেখা এবং মঈন চৌধুরীর দুটি লেখা; মোট চারটি লেখা নিয়ে প্রকাশিত এই বইটিতে পাঠক সিরিয়াস আলোচনার রস আস্বাদন করবেন প্রায় উপন্যাস পাঠের মতো মজা করে/ কলিম-মঈন বিতর্ক শুরুর পর থেকে, ধীরে ধীরে, ক্রমেই জমে উঠেছে; পাঠক এ-চারটি রচনা পাঠ করতে করতে নিশ্চয়ই এর সত্যতার প্রমাণ পাবেন।

কলিম খানের সঙ্গে মঈন চৌধুরীর মূল বিরোধ ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাভাষা নিয়ে; তবে জনাব কলিম যে বাংলাভাষী লোকজনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারতের মতো সম্পদকে সর্বভারতীয় বলেছেন, তা জনাব মঈন চৌধুরী মেনে নিতে রাজি হননি। এসব প্রসঙ্গের পাশাপাশি বাংলাভাষার বানান সংস্কারের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে দুজনেরই আলোচনায়। মঈন চৌধুরী তার শেষ প্রতিক্রিয়ার শেষাংশে বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে আমি এ-ব্যাপারে আলোচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কলিম খানের সাথে যোগাযোগ করতে পারি এবং তিনি যদি যৌক্তিকভাবে আমাকে ব্যাপারটি বোঝাতে পারেন তবে রবি চক্রবর্তীর সাথে আমাকেও তিনি তার সঙ্গী হিসেবে পাবেন।'

সবশেষে আশা করি, আশা করা চলে, বাংলাভাষার বানান সংস্কার : কলিম-মঈন বিতর্ক গ্রন্থটি পাঠকের ভালো লাগবে। সচেতন পাঠক এটি সংগ্রহ করবেন। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে প্রাবন্ধিক ও গবেষক কলিম খান এবং কবি ও প্রাবন্ধিক মঈন চৌধুরী যদি এ-বিষয়ে আরও লেখেন, সেগুলো পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্যকোনো ভাষাতাত্ত্বিক বা আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া লিখলে, সেগুলোও পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বইটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কবি শরমিন নিশাত সার্বিক সহযোগিতা করেছে; তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই—আর বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার কারণে এর প্রকাশক'কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
ঢাকা
০১ .০২. ২০০৭

ক লি ম খা ন

বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ!?

... অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ ।
[ভাষা ও ছন্দ/ রবীন্দ্রনাথ]

আটকাচ্ছে কোথায়?

রব উঠেছে–বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধান করতে হবে । একদল বলছেন, করতে হবে, করতেই হবে । অপর দল বলছেন–করা চলবে না, চলবে না । দেখে-শুনে মনে হতে পারে–তাই তো! এঁদের সমস্যাটি কী? আটকাচ্ছে কোথায়? বানানের সমতাবিধান না-করলে আটকাচ্ছে কোথায়? করতে গেলেই-বা আটকাচ্ছে কোথায়?

আটকাচ্ছে বহু জায়গাতেই । তবে, সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি আটকাচ্ছে কমপিউটারে । বাংলা বানানের সমতাবিধান করে না-দিলে সে কিছুতেই পথ ছাড়ছে না । কারণ, বাংলা বানানের সমতা না-থাকায় প্রকাশনাশিল্পে নিযুক্ত কমপিউটারের কাজের বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে ।

সবাই জানেন, ছাপাছাপির দুনিয়া এখন কমপিউটার-প্রযুক্তির দখলে । আর, কমপিউটার-প্রযুক্তি 'বানান-সংশোধক' বা প্রুফ-রিডারের কাজটি নিজেই করে থাকে 'স্পেল-চেক' নামে একটি সফটঅয়ারের সাহায্যে । তবে সেই 'স্পেল-চেক' নামক সফটঅয়ারটি বানানোর জন্য একটি সুস্থির বানানরীতি বা সর্বমান্য বানান-অভিধানের প্রয়োজন হয় । ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষারই সেরকম 'স্ট্যানডার্ড' বানান রয়েছে । তাই ইংরেজি ভাষায় ছাপাছাপির কাজ করতে কমপিউটারের কোনো অসুবিধা হয় না । যা-ই লেখা হোক, সেটি কমপিউটারের মস্তিষ্কে 'স্পেল-চেক' সফটঅয়ারে রাখা বানানের সঙ্গে না-মিললেই সে লেখাটির নীচে লাল দাগ দিয়ে দেয় এবং শুধোলে জানিয়ে দেয় বানানটি কেমন হলে ঠিক হবে । যেসব ভাষার 'স্থির-বানানরীতি' রয়েছে, সেইসব ভাষার 'স্পেল-চেক' সফটঅয়ার বানিয়ে ফেলা গেছে । সেসব ভাষায় কোনো বই ছাপতে চাইলে প্রতি মুহূর্তে কমপিউটার তার ডিটিপি-অপারেটরকে ভুল বানানের হাত থেকে রক্ষা করে । কিন্তু বাংলাভাষার ক্ষেত্রে সে-সুযোগ নেই । তাই, বাংলাভাষার প্রকাশনার ক্ষেত্রকে এখনও প্রুফ-রিডারের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাতে অর্থ ও সময় দুটোই যায় বেশি । ফলে, প্রকাশনার ব্যবসায়িক দুনিয়াতে ইংরেজি প্রকাশনার তুলনায় বাংলা প্রকাশনার ব্যবসা পিছিয়ে পড়েছে । এর কারণ, বাংলাভাষায় কোনো সর্বমান্য স্পেল-চেক সফটঅয়ার এখনও তৈরি করা যায়নি । যায়নি প্রযুক্তিগত কারণে নয়, বাংলাভাষার সারস্বতলোকে বা শিক্ষামহলে স্ট্যানডার্ড বানানের কোনো সর্বমান্য তালিকা বা 'স্থির বানানরীতি' নেই বলেই এই অসুবিধা দেখা দিয়েছে ।

বাংলাভাষায় কোনো 'স্থির-বানানরীতি' নেই কেন? স্ট্যানডার্ড বানানের অভিধান নেই কেন? এযাবৎ কি তা হলে যে-যার খুশিমতো বাংলা শব্দের বানান লিখেছেন?

হ্যাঁ, কতকটা তা-ই। বলতে গেলে, এখনও বাংলা শব্দের বানান যে-যার খুশিমতোই লিখে থাকেন। 'করল' কথাটি 'করিল', 'কোরলো', 'করলো', 'কোরল' কমবেশি পাঁচ রকমই লেখা হয়; ' হৈচৈ' লেখা হয় 'হইচই', 'হই-চই', 'হই চই', 'হৈ-চৈ', ' হৈ চৈ'... এইরকম অজস্র। বলতে কি, বাংলাভাষার অভিধানগুলো পরস্পর থেকে যথেষ্ট আলাদা। একটি ভাষার আঞ্চলিক রূপ যেমন বহুরকমের হয়, তেমনি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বাংলাভাষাও, লিখিত রূপের বিচারে, বহুরকমের হয়ে রয়েছে। প্রাচীন বাংলার (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ইত্যাদির) বানান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বানান, বিশ্বভারতীর বানান, বাংলা অ্যাকাডেমির বানান, আনন্দবাজারের বানান, বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানসমূহের বানান, প্রতিষ্ঠানে পরিণত কবি-সাহিত্যিকদের যার-যার তার-তার বানান–সব আলাদা আলাদা। একই বই বিশ্বভারতী ছাপলে একরকম, কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমি ছাপলে আর একরকম, বাংলাদেশ ছাপলে আরও অন্য রকম, লিটল ম্যাগওয়ালা ছাপলে তাঁদের মতো। ...ভাবতেও অবাক লাগে যে, যে-ভাষায় একজন কবি নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়ে গেছেন, সেই ভাষাতে এতকাল এই বানান-নৈরাজ্য চলে আসছে! সম্প্রতি আবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে অ্যাকাডেমি অভিধানের বানান অনুসারে লক্ষ লক্ষ টাকার বই ছেপে, বিরোধীদের চাপে ফেলে রাখা হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে। (উদ্যোগ চলছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে তাকে বাস্তবায়িত করার। যদি তা করা যায়, বাংলাদেশের লিখিত ভাষার সঙ্গে আমাদের লিখিত ভাষার ফারাক যথেষ্ট বেড়ে যাবে।) তার মানে, বানান-সমস্যার কারণে এতকাল বাঙালির মনে যে-মার পড়ছিল, সে তো পড়ছেই, এখন আবার শরীরের (টাকার) মারও পড়তে শুরু করেছে।

এসব দেখে-শুনে যে-কোনো বঙ্গভাষী ও বাঙালি অভিভাবক ভাবতেই পারেন–এ তো ভয়ানক অবস্থা! এই অবস্থায়, আমরা সাধারণ বাঙালিরা, লেখালেখির সময় কোন বানান অনুসরণ করব? আমাদের বাংলাভাষাভাষীদের উত্তরসূরিরা কোন বানান শিখবেন? কতরকম বানান শিখবেন?

তাই, অনেকেই চাইছিলেন বাংলা বানানের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ঠিক করা হোক এবং সেই অনুযায়ী একটি সর্বমান্য বাংলা অভিধান লেখা হোক। সেই চেষ্টারই সাম্প্রতিক ফলশ্রুতি কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমির বানান অভিধান। কিন্তু অনেকেই সেই অভিধানের সমস্ত বানানের সঙ্গে একমত পোষণ করেন না। অনেক প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ বানানবিধিও রয়েছে। কিন্তু তাদের কোনো-একটিকে স্ট্যানডার্ড বাংলা বানানরীতি বলে আজও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়নি। এমনকি জ্ঞানীগুণিজনেরা সবাই একমত হয়ে একটি সর্বজনমান্য বানানবিধি বা সর্বসম্মত বানান অভিধান এখনও রচনা করে উঠতে পারেননি।

কমপিউটার-প্রযুক্তি কিন্তু তাঁদের এসব অক্ষমতার কথা শুনতে নারাজ। স্পেল-চেকের প্রয়োগ করে ইংল্যান্ড আমেরিকায় সে 'প্রুফ-রিডার' নামক পেশাদারদের বিলুপ্ত করে দিয়েছে। বাংলায় সেটি না-করে সে ছাড়বে না। কারণ, প্রযুক্তির নিয়মের তো কোনো 'নিপাতনে সিদ্ধ' হয় না। সেজন্যই কমপিউটার-প্রযুক্তি তার নিজস্ব চেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছে। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাভাষাতেও দু-একটি 'স্পেল-চেক' সফটঅয়ার সে তৈরিও করে ফেলেছে।

কিন্তু সে-তো বাংলা অ্যাকাডেমির বানানবিধি কিংবা সংসদের বানানরীতি অনুসরণ করে বানানো। সবাই তো সে-বানান মানেন না, অনুসরণও করেন না। ফলে, সেই সফটঅয়ার বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অতএব একটি স্ট্যানডার্ড বাংলা বানান বা স্থির বাংলা বানানরীতি তার চাই-ই চাই—এমন বানানরীতি, যা সমস্ত বাংলাভাষাভাষী মানুষ দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেবেন, ব্যবহার করবেন। এরকম না-হলে প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত কমপিউটার-প্রযুক্তি কিছুতেই সহ্য করবে না।[১]

রইল বাকি বিশ্বের কাছে মাথা তুলে বলার প্রশ্ন। যে-কোনো বিদেশি, যিনি কোনো কারণে বাংলাভাষার পাঠ নিতে চাইবেন, তিনি তো বলবেনই—কী ভাই! আপনাদের ভাষা পৃথিবীর অন্য ভাষাগুলির মতো নয় কেন? এক শব্দের একরূপ বানান নেই কেন? আমাদের ইংরেজি ফরাসি জার্মান, আমাদের সকলের ভাষার তো সে-যোগ্যতা রয়েছে, বাংলাভাষার কী হল? ভাষাটি কি এরকম নাবালক হয়েই থাকবে! আপনারা ভাষার সংস্কার করেননি কেন? আপনাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে কীভাবে?...

অর্থাৎ, বাংলা বানানের সমতাবিধান না করলে আটকাচ্ছে বহু জায়গাতেই। তাই বাংলা শব্দের বানানের সমতাবিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

দুই.

বাংলা বানানের সমতাবিধান করতে গেলে আটকাচ্ছে কোথায়?

বাংলা 'বানানের সমতাবিধান' করে নতুন বানানবিধি প্রস্তুত ও রূপায়ণের চেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁদের কার্যাবলির দিকে তাকালে এবং যাঁরা তাঁদের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা কোথায় কোথায় কী কী কারণে বিরোধিতা করছেন, তার মুসাবিদা করলেই বোঝা যাবে আটকাচ্ছে কোথায়।

নতুন বানানরীতি রূপায়ণের চেষ্টা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে। তাঁরই অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালের ৮ মে তৎকালীন বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের সহায়তায় 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা বানানের সমতা আনার চেষ্টার সূত্রপাত ঘটান। বলা হচ্ছে, সেই চেষ্টাই অনুবর্তিত হয়ে হয়ে, ক্রমশ কিঞ্চিদধিক পরিবর্তিত হয়ে, রূপ পেয়েছে প্রথমে বিশ্বভারতীয় প্রচেষ্টায়, তারপর সংসদ, বাংলা অ্যাকাডেমি, আনন্দবাজার গোষ্ঠীর নিজ-নিজ চেষ্টায়। (বাংলাদেশেও, বলতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই বানানে সমতা আনার একটা নিরন্তর চেষ্টা চলে আসছে। যদিও, শুনেছি, কলকাতার ভাষাপণ্ডিতেরা বাংলাদেশের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা না-বলেই নিজেদের মতো বানান সংস্কার করছেন।) সে যাই হোক, এঁরা সবাই বানানে সমতা আনতে গিয়ে (এখানে রেফ-এর পর দ্বিত্ব বর্জন করুন, ওখানে দীর্ঘ ঈ লেখার প্রয়োজন নেই... ইত্যাদি বিধির২ কথা বলে) প্রকৃতপক্ষে কী করতে চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন, সেকথা স্পষ্ট করে কেউ বলেননি। তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কী করতে চায় তা স্পষ্ট করে নির্দেশ জারি করে দিয়েছে—বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সমস্ত স্কুলপাঠ্য বইয়ের ভাষাকে বর্তমানে-প্রচলিত চলিত ভাষায় বদলে নিতে হবে, সাধুভাষা বাদ দিতে হবে। সাধুভাষায় লেখা রচনাসমূহ পড়াতে হলে তা পড়াতে হবে অষ্টম শ্রেণী থেকে। আর সমস্ত ক্ষেত্রেই বাংলা অ্যাকাডেমির বানানবিধি স্মরণ করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু কথা তো হচ্ছিল কেবল বানানের সমতাবিধানের! অথচ নির্দেশ জারি হচ্ছে সমতাবিধানের সাথে সাথে বাংলাভাষাকেও সংস্কার করে নেওয়ার! এরকম হচ্ছে কেন? বাংলাভাষাকে সংস্কার না-করে কি তার বানানের সমতাবিধান করা যাচ্ছে না?

সম্প্রতি একই সুরে সুর মিলিয়েছেন সুখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ভাষাবিদ নন বলে তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া একেবারেই ঠিক নয়। এক বিশালসংখ্যক বাঙালির প্রতিনিধিত্ব আছে তাঁর স্বরে। তিনি আজকের পশ্চিমবাংলার কবিসাহিত্যিকদের শিখরে বাস করেন। তাঁর কথার মূল্য জনসাধারণ্যে অত্যন্ত প্রবল। সর্বোপরি রয়েছে অনেকের ভরসাযোগ্য তাঁর 'কবিমানস'টির বিবেক। তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃতের... সূক্ষ্ম নিয়ম আমরা মানতে যাব কেন? সংস্কৃতের কাছে আমাদের এমন কী দায়বদ্ধতা আছে?' [আমাদের হ্রস্‌সি দীর্ঘি জ্ঞান/দেশ/০২.০৭.০৪]। কেবল তাই নয়, বাংলাভাষা থেকে 'লিঙ্গ'শব্দ যুক্ত (যথা 'পুংলিঙ্গ', 'স্ত্রীলিঙ্গ' প্রভৃতি) শব্দগুলি বাদ দিয়ে দেওয়ার পক্ষেও তিনি স্পষ্ট মতপ্রকাশ করেছেন। 'উত্তমপুরুষ-মধ্যমপুরুষ-প্রথমপুরুষ' প্রভৃতি শব্দগুলিকে বাদ দিয়ে 'আমিপক্ষ-তুমিপক্ষ-সেপক্ষ' প্রভৃতি শব্দের প্রচলনের যে-বিধান শ্রী পবিত্র সরকার মহাশয় দিয়েছিলেন, সুনীলবাবু সেই বিধানের পক্ষেও সওয়াল করেছেন। সর্বোপরি তিনি 'বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয়' বলে মত প্রকাশ করেছেন। [...ঐ...]। মোট কথা, কোনোও কুতর্ক নয়, যথেষ্ট যুক্তিসংগতভাবেই এবং গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি সংস্কৃতভাষা ও বাংলাভাষার ভিতরের সম্পর্ক ছেদ করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আর, এসব কথা যে সুনীলবাবু একাই বলছেন তা নয়, বানানের সমতাবিধানের পক্ষে যাঁরাই সওয়াল করছেন, তাঁদের সকলের মনোভাব কমবেশি এরকমই।

এঁরা সবাই সংস্কৃতভাষার বিরোধী, এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। এঁদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, আসলে এঁরা চান বাংলাভাষাটি সম্পূর্ণরূপে ইংরেজির মতো 'সাবালক' ভাষা হয়ে যাক। অর্থাৎ ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রতিটি শব্দের একটি করে সুনির্দিষ্ট 'নির্দেশকতা' (refentiality) বা 'মানে' থাকবে এবং সেই শব্দের বানানও হবে সুনির্দিষ্ট। এরকম হলেই ভাষা 'সাবালক' হয়েছে বলে একালে মনে করা হয়। তার মানে, 'এক শব্দের একটি অর্থ ও একরূপ বানান' রীতিটি আমাদের বাংলাভাষাও অনুসরণ করুক। ভাষার স্বভাবকে এইরকম করে নিতে পারলে (ভাষার স্বভাব খানিকটা যান্ত্রিক হয়ে যায় কি না, হলে লাভ হয় না ক্ষতি হয়, সে অন্য এক প্রসঙ্গ), তাকে 'হ্যান্ডল' করতে কমপিউটার যন্ত্রের আর কোনো অসুবিধা থাকে না। তা ছাড়া ইংরেজ, ফরাসি, রুশ, জার্মান সবাই সেরকম করেছে, আমরা না-করে পিছিয়ে থাকব কেন! মোট কথা, তাঁদের সওয়াল হল–অন্য 'সাবালক' ভাষাভাষীরা যেমন করেছেন আমরাও তেমন করে ফেলব না কেন?

কিন্তু তা-ই করতে গিয়ে মোদ্দা কথাটি এই দাঁড়িয়েছে, যে, বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত করে আনতে হবে এবং তারপর বানানের সমতাবিধান করতে হবে। অর্থাৎ, এখন যাঁরা আমাদের বাংলা বানানের সমতাবিধানের রূপকার, তাঁরা সংস্কৃতকে সহ্য করতে আর রাজি নন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে যে-'ডাইরেকটিভ' দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে–এমন বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা করা হোক, যার সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ('sever') করে ফেলা গেছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে

কলকাতার বেশ কয়েকজন নামকরা ভাষাবিদ রয়েছেন। তাতে আবার সুনীলবাবুর মতো বর্তমান বাংলাসাহিত্যের শিখরচারী বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনও রয়েছে। ওদিকে বাংলাদেশের বাংলাভাষাচর্চাকারী বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ, যাঁরা উর্দু আরবি ফারসি ভাষার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত পছন্দ করেন, তাঁরাও নাকি চাইছেন, এমন বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা হোক, যাতে সংস্কৃতের (হিন্দুত্বের) গন্ধ পর্যন্ত না থাকে। সম্ভবত তাঁরা মনে করেন, সংস্কৃত আর হিন্দুত্ব একই ব্যাপার। আর, যাঁরা হিন্দু মৌলবাদী, তাঁরা সংস্কৃত থেকে বাংলাভাষার এই 'মুক্তিসংগ্রামের' ভিতরে স্বভাবতই হিন্দুবিরোধী চক্রান্ত দেখতে পাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! কারণ, তাঁরা তো বিশ্বাসই করেন, হিন্দুত্ব ও সংস্কৃত একই ধর্মের এপিঠ-ওপিঠ। বিপরীতে, পশ্চিমবাংলার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী, হিন্দু মৌলবাদীরা যা-ই বলবেন তার উলটো বলাটাই যাঁরা উচিত কাজ বলে বিবেচনা করে থাকেন, তাঁরাও সম্ভবত হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং সংস্কৃতের বিরুদ্ধে যাওয়াকে তুল্য জ্ঞান করেন। ওদিকে, বাংলাভাষার সংস্কৃত-নির্ভরতাকে বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেউ-কেউ মুসলিমবিরোধী বলে মনে করে থাকেন। কেউবা মনে করেন, বাংলার গায়ে যে সংস্কৃতের গো-গঙ্গাজলের গন্ধ রয়েছে তাকে উর্দু-আরবি-ফারসির আতর দিয়ে 'রিপ্লেস' করাই উচিত। শুনছি, তাঁদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নাকি ওই বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই। অর্থাৎ সবাই যেন একথা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন যে, সংস্কৃতভাষা হিন্দুদের ভাষা, হিন্দুত্ববাদীদের ভাষা, বিজেপির ভাষা—ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মানুষের আদিম পূর্বপুরুষদের ভাষার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, নেই। এবং অতএব, সংস্কৃত-নির্ভর বাংলাভাষাও হিন্দুঝোঁকা। সুতরাং সংস্কৃত বাদ দাও! সংস্কৃতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করো। এমন বাংলা চাই যার গায়ে সংস্কৃতের গন্ধ পর্যন্ত নাই—পিয়োর বাংলা চাই, পূত-পবিত্র নিখাদ বাংলার প্রতিষ্ঠা চাই! কিন্তু কোনটি পূত-পবিত্র বাংলা, সেটি বোঝা যাবে কেমন করে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-বাংলা চান, সেটিই কি পিয়োর বাংলা, পবিত্র সরকারি বাংলা? নাকি বাংলাদেশের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর উর্দু-আরবি আতরসিঞ্চিত বাংলাই পবিত্র বাংলা, নেক-বাংলা? যাই হোক, সব মিলিয়ে বাংলাভাষাকে তার অতীত থেকে আলাদা করে ফেলার এক আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে নাড়ির সম্পর্ক এখনও কমবেশি বিদ্যমান, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউই যে-সম্পর্ক 'সম্পূর্ণরূপে'ও ছিন্ন করতে চাননি, এবার তা নিশ্চয়ই ছিন্ন করা যাবে। তার মানে, বানানের সমতাবিধান করতে গিয়ে বাংলাভাষার সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। সেটি না-করে নিশ্চয় বানান-সংস্কার করা যাচ্ছে না বলেই বানানের সমতাবিধায়কগণ বাংলাভাষাকে সংস্কার করে নেওয়ার এই চেষ্টা চালাচ্ছেন। নিশ্চয় ব্যাপারটি এইরকম যে, বাংলাভাষাকে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন না-করে তাকে 'সাবালক' করা যাচ্ছে না, 'কমপিউটার-ফ্রেন্ডলি' করা যাচ্ছে না, 'আপডেট' করা যাচ্ছে না। মনে হয়, আমরা আসলে বাংলাভাষার বানানে সমতাবিধান করতে গিয়ে ভাষা-সংস্কারের খপ্পরে পড়ে গেছি। তা হোক। অনেক সময় ঘরবাড়ি রং করতে গিয়ে দেখা যায়, কিছু-কিছু রিপেয়ারিঙের কাজ না-করে নিলেই নয়। তখন অনন্যোপায় হয়ে প্রথমে প্রয়োজনীয় রিপেয়ারিং সেরে নিতে হয় এবং তারপর রং করতে হয়। আমাদের ভাষার ব্যাপারেও না-হয় তা-ই করব। প্রথমে প্রয়োজনমতো ভাষা-সংস্কার করে নিয়ে বানানের সমতাবিধান করব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বাংলাভাষাকে সংস্কারের কথা পাড়লেই কিছু লোক একেবারে রে রে করে সবেগে তেড়ে আসছেন। প্রবল বাধার সৃষ্টি করছেন। চেঁচামেচি

করছেন। এমন বাধার সৃষ্টি করছেন যে, সমতাবিধায়কদের৪ পরামর্শে ছাপা বই সমস্ত ফেলে রাখতে হয়েছে।

যাঁরা এরূপ করছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য হল—বাংলাভাষাকে সংস্কারের নামে যা করতে চাওয়া হচ্ছে, তাতে সমগ্র বাঙালি জাতিটাই নাকি 'সাংস্কৃতিক-সর্বহারা'য় পরিণত হয়ে যাবে—পকেট খালি, মাথাও খালি। স্বয়ং মার্কস সাহেবও বাঙালি জাতির জন্য এত বড়ো শাস্তির বিধান দিতে পারতেন কি না সন্দেহ। মাথা-খালি মানুষ তিনি কখনও চাননি। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এ কাজে মার্কসের বঙ্গীয় উত্তরসূরিরাই বাংলাভাষার এই সংস্কারকদের সমস্ত শক্তির ভিত্তি। 'সর্বহারার-সংস্কৃতি'র সঙ্গে 'সাংস্কৃতিক-সর্বহারা'র যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা কি তাঁরা জানেন না!

ভয়ংকর অভিযোগ সন্দেহ নেই। স্বভাবতই আমরা জানতে চাইব, এমন অভিযোগের সারবত্তা আছে কি না। থাকলে তা কীরূপ? সে-সারবত্তা কি এমন যে, বাংলাভাষাকে সংস্কার করাই যাবে না? নাকি এমন যে, বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে সংস্কার করলে, তাঁদের ওই অভিযোগের নিরসনও হবে, আবার বর্তমান যুগের প্রয়োজনও মেটানো যাবে? নাকি বাংলাভাষাকে সংস্কার করার কোনো রাস্তাই নেই? তা-ই যদি হয়, তা হলে তো বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধানের প্রশ্নটি ঝুলে থেকে যাবে। থেকে যাবে যুগের প্রয়োজন মেটানোর প্রশ্ন। কিন্তু দ্বারে সমাগত নতুন-প্রযুক্তি আমাদের ছাড়বে কি? যতদূর জানি, সমাজে আগত নতুন প্রযুক্তি কাউকে কখনও ছেড়ে দিয়েছে, ইতিহাসে এমন নজির নেই।

যাই হোক, আমরা বুঝতে পারছি, বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধানের কাজটি যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, বাংলাভাষার সংস্কারের কাজটি তার অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে, আর সেজন্যই সমতাবিধানের কাজটি করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, ভাষা-সংস্কারের প্রয়োজনীয় কাজটি না করে বানানের সমতাবিধান করা যাবে না।

তিন.

বাংলাভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাচ্ছে না কেন? একালের ভাষাবিধায়কদের কথাবার্তা নির্দেশাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার হল–সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের হাত থেকে এবং বাংলা সাধুভাষা থেকে বর্তমান বাংলাভাষার মুক্তিসাধন। তার মানে বাংলাভাষার ব্যবহার থেকে, চর্চা থেকে, অভিধান থেকে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ, ও সাধু শব্দসমূহ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে। বর্তমানে যাঁরা বাংলাভাষার 'প্রয়োজনীয় সংস্কার' করতে চাইছেন, তাঁদের বাসনা এই। কেন? ওই শব্দগুলি কি বিষগর্ভ? নোংরা, অসভ্য, নেটিভ? নাকি লাদেনের মতো 'মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী' হয়ে উঠেছে? কী আছে ওই শব্দগুলির ভেতরে যে, আমরা একালের বাঙালিরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিত্যব্যবহার্য ওই শব্দগুলিকে এমন ভয় পাচ্ছি কিংবা ঘৃণা করছি? শব্দগুলির প্রতি আমাদের এমন বীতরাগ কেন যে, সেগুলিকে 'অস্পৃশ্য' 'অচ্ছুৎ' ঘোষণা করে তাড়াতে না-পারলে আমাদের পিয়োর-বাংলাবাদী ভাষা-বিধায়কদের চলছে না? এতকাল জানতাম, সংস্কৃতবাদী উন্নাসিক ভাষাবিধায়করা, যাঁদের জ্বালায় রবীন্দ্রনাথ অনেক জ্বলেছেন, তাঁরা আমাদের সাধারণ বাঙালির মুখের অনেক শব্দকে 'চণ্ডাল' বলে ঘোষণা করে 'অস্পৃশ্য' করে দিয়ে, বাঙালির ভাষাব্যবহারে 'গুরুচণ্ডালি' মিশ্রণ নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন কি তবে উলটোরথের পালা শুরু হল? এখন থেকে কি তবে সংস্কৃত মানেই শূদ্র, ম্লেচ্ছ, ছোটোলোক, এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরাও ছোটোলোক! 'পবিত্র- নেক বাংলাভাষা'র এলাকা থেকে তাদের উদ্বাস্তু করে তাড়িয়ে দিতে হবে, দেশান্তরী করে দিতে হবে! যাঁরা তাড়াতে রাজি হবেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ, মেলামেশা বন্ধ! তাদের মাস্টার-ডাক্তার বন্ধ (ধোপা-নাপিত বন্ধের 'আধুনিক সংস্করণ')! সত্যিই তো! সংস্কৃতের ওপর, তৎসম শব্দের ওপর, সাধু শব্দের ওপর আমাদের বানানের সমতাবিধায়কদের এত রাগ কেন? তারা এঁদের বানানের সমতাবিধানের কাজে কী এমন ঝামেলা পাকিয়েছে? জানা দরকার! কী ঝামেলা পাকিয়েছে, তা জানার জন্য বেশি দূর যেতে হবে না, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আমাদের হ্রস্‌সি দীর্ঘি জ্ঞান' নিবন্ধটি থেকেই সেসব কথা জানা যেতে পারে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বানানের সমতাবিধায়কগণ যখন ইতোমধ্যেই রানীকে রানি, কাহিনীকে কাহিনি করেছেন, তখন শিল্পীকে শিল্পি, মন্ত্রীকে মন্ত্রি, শশীকে শশি, ফণীকে ফণি, স্বামীকে স্বামি করলে কী এমন 'মেনিফেস্টো' অশুদ্ধ হয়ে যাবে? সত্যিই তো, সব বাঙালিই যদি দীর্ঘিকে হ্রস্‌সি লেখেন, ক্ষতি কোথায়? শিল্পীকে শিল্পি লিখলে শিল্পীর কি মানে বদলে যাবে, সে শিল্পসৃষ্টির কাজ ছেড়ে দিয়ে তুলি-কলম দিয়ে কাঠ কাটতে লেগে যাবে? তা না-হলে অসুবিধা কোথায়? বানান প্রয়োজনমতো বদলালেও মানে যদি না বদলায়, তবে বানানের সমতাবিধান করতে গিয়ে প্রয়োজনানুসারে বানান বদলানো যেতেই পারে। অসুবিধে কী? অসুবিধা আছে। তবে সে-অসুবিধা বর্তমানের নয়, অতীতের, ভূতের। সে-ভূতের চোখরাঙানি সুনীলবাবুও দেখে ফেলেছেন এবং ভয়ে পিছিয়ে এসেছেন। তিনি লিখেছেন–'যে-সব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি এসেছে, অর্থাৎ তৎসম, সেগুলি থাকবে অপরিবর্তিত। সেগুলিতেও দীর্ঘ-ঈর প্রয়োজনীয়তা থাকুক বা না থাকুক, সংস্কৃতের প্রতি সম্মান জানাতেই বোধহয় সেগুলির বদল হবে না। এ নির্দেশ শিরোধার্য।' এই নির্দেশ কাদের? তা শিরোধার্যই-বা কেন? সুনীলবাবু জানিয়েছেন নির্দেশটি 'একালের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদগণ'-এর এবং 'সংস্কৃতের প্রতি সম্মান জানাতেই বোধহয়' এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'বোধহয়' কেন? কারণ তিনি জানেন না, প্রয়োজনীয়তা থাকুক বা না-থাকুক সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ-

ঈ যেমন আছে বাংলার বেলায় তেমন রাখতেই হবে কেন। কেন জানেন না? কারণ 'ভাষাবিদগণ' তাঁদের নির্দেশের পিছনে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেননি, যা সুনীলবাবুকে (এবং তাঁর মতো আরও অনেককেই) 'প্রয়োজনীয়তা'টি বুঝতে সাহায্য করে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'বোধহয়' সংস্কৃতের প্রতি সম্মান দেখাতেই বাংলার ঘাড়ে ওইরূপ দায়িত্বপালনের বিধান। কী মুশকিল! ভাষা'বিজ্ঞানে' আবার মান-সম্মান কী! ঠিক-বেঠিকটাই প্রশ্ন। দেখতে হবে নির্দেশটি ঠিক না ভুল। আর, এসব কথা বললেই 'প্রসিদ্ধ ভাষাবিদগণ' দীর্ঘ-ঈ রাখার 'প্রয়োজনীয়তা'টি কোথায়, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন–কোন শব্দ কোন ধাতুর সঙ্গে কী প্রত্যয় যোগ করে কীভাবে তৈরি হয়েছে সেকথা বলে দেবেন। দেখিয়ে দেবেন, শব্দটির সম্পর্কে পাণিনিকৃত ব্যুৎপত্তি-বিচারের সাংবিধানিক বিধির ধারা-উপধারার কী কী বিধান রয়েছে। সবাই জানেন, সেই পাণ্ডিত্যের সামনে দাঁড়িয়ে থরহরি কম্পমান একালের কবি-সাহিত্যিকদের মুখে কথা সরে না। কিন্তু তাঁদের মনের কথা বুকের ব্যথায় তা-ও থেকে যায়–কী ধাতুর সঙ্গে কী প্রত্যয় জুড়ে শব্দটি তৈরি হয়েছে, সেকথায় আমাদের কী প্রয়োজন? 'শিল্পিন্ শব্দ কর্তৃকারকের একবচনে প্রথমা বিভক্তি সহযোগে শিল্পী হয়' জেনে আমাদের কী হবে? আমরা তো জানতে চাই artist বা শিল্পস্রষ্টা বোঝাতে যে-'শিল্পী' শব্দটি লিখব, তাতে হ্রস্‌সি লিখব না দীর্ঘি লিখব, হ্রস্‌সি লিখলে ক্ষতি কী? দীর্ঘি লিখলে লাভ কী? আর যদি দীর্ঘির মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে নেহাত কষ্টই হয়, দরকার কী ছেঁড়ার, রানী, কাহিনী, শিল্পী সবই দীর্ঘি-কার করে দিলেই তো হয়। তখন আবার 'ভাষাবিদগণ' আপত্তি তুলবেন–তাই বলে কিন্তু শিল্পীজন, শিল্পীশালা, শিল্পীসঙ্ঘ লেখা যাবে না, সেরকম লিখলে সংস্কৃত ব্যাকরণ রেগে যাবে। সুনীলবাবু তাই 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, জ্যোতিভূষণ চাকী' প্রমুখ ভাষাবিদগণের কাছে জানতে চেয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ না-মানলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা কোথায় তাঁরাও জানেন না। কারণ, তাঁরা তো এই মূল কথাটাই অবহিত নন, যে, সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের প্রতিটি বর্ণই (ধ্বনিই) অর্থ ধারণ করে, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই যে-নিয়ম নেই। যতদূর জানা যাচ্ছে, পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র জীবিত ভাষা, যাতে এখনও এই নিয়ম কমবেশি প্রচলিত রয়েছে।৫ এটা যদি তাঁরা জানতেন বা মানতেন৬, তবে তো আমরা বাঙালিরা ভাষাপৃথিবীর শিখরে বাস করতাম। সারা পৃথিবীই আমাদের ভাষার জন্য আমাদের ধন্য ধন্য করত। শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রসিদ্ধ ভাষাবিদগণ'-এর মতে, তদ্ভব বাংলা শব্দের বানান নিয়ে বাপু যা ইচ্ছা করো, তৎসম শব্দে সেসব করতে যেয়ো না। তৎসম শব্দের বানান যেমন রয়েছে, তেমন রাখতে হবে। এ-নির্দেশ শুনে সুনীলবাবু পড়েছেন মুশকিলে, যে-মুশকিলে প্রায় সব বাঙালি ছাত্রই পড়েন। কোন শব্দটি তৎসম আর কোনটি তদ্ভব, শব্দের গায়ে তো সেকথা লেখা থাকে না। চেনা যাবে কেমন করে! সুনীলবাবু আরও জানিয়েছেন, '...পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদুটি দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু!' তাই এগুলিকে বিদেয় করে দেওয়া ভালো। কেন দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু? কারণ তাঁর মতে, 'সব শব্দই এক একটি ছবি আনে আমাদের মানসে, যেমন আকাশ, যেমন নদী, যেমন হরিণ ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ছবি যখন-তখন মনে আনা শোভন বা রুচিসঙ্গত নয়।' কিন্তু তা হলে তো খোদ 'ভগবান'কেই বাদ দিয়ে দিতে হবে। কারণ শব্দটির ভিতরে 'ভগ' রয়েছে। নিশ্চয়ই কথাটি তাঁর মনে 'শোভন ও রুচিসম্মত' ছবি আনছে না। রইল বাকি আলিঙ্গন, লিঙ্গপূজা, লিঙ্গদেব, লিঙ্গায়েৎ, অমৃতলিঙ্গম, নিজলিঙ্গাপ্পা, যোনি, ব্রহ্মযোনি, অযোনিসম্ভবা,

ভগবতী, সুভগা, ভগবদ্‌গীতা, ভগিনী, স্তন, কুচ, চুচুক, পয়োধর, জঙ্ঘা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, জানু, আজানুলম্বিত, রমণী, রমণীয়, রমণীমোহন, রাধারমণ, সঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, সাগরসঙ্গম, রতি, আরতি, বিরতি, রতিকান্ত, রতিবিলাপ, রন্ধনশালা, পাঠশালা ইত্যাদি অজস্র 'দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু' শব্দের কথা। ইংরেজি 'লিঙ্গুসটিকস', 'লিঙ্গুয়া' কিংবা 'ভগইনা' (vagina/ভেজাইনা) প্রভৃতি শব্দের কথা নাহয় আপাতত তোলাই থাক। কিন্তু একবার 'দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু' বলে বাদ দিতে শুরু করলে বাংলাভাষার শব্দভাঁড়ার তো অচিরেই অর্ধেক৭ হয়ে যাবে! পাঞ্জাবি ভাষা নিয়ে যে একটা মস্করা চালু আছে, যে, তার ৫০ শতাংশ শিখলেই পাঞ্জাবি ভাষা শেখা হয়ে যায়, বাকিটা শিখতে লাগে না, কারণ বাকি ৫০ শতাংশই নাকি অশ্লীল গালাগালি, যা সবাই কমবেশি জানে–বাংলাভাষারও কি সেই দুর্দশা হয়ে গেল? 'আদ্ধেকটাই' অশোভন! অরুচিসম্মত, অশ্লীল! নিঃসন্দেহে ভগবান, ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি শব্দকে অশোভন বলে ত্যাগ করতে বহু এশিয়াবাসীই রাজি হবেন না, বাঙালিরা তো বটেই। তা ছাড়া, যাঁরা রাধারমণের ভক্ত কিংবা যাঁদের নাম রাধারমণ, রমণীমোহন, তাঁরা কী করবেন? সুখ্যাত রাধারমণ মিত্র মহাশয়ের নাম কি বাংলাভাষায় আর লেখা যাবে না? কী হবে রতিকান্তদের? তা ছাড়া 'অমৃতলিঙ্গম', 'নিজলিঙ্গাপ্পা' প্রভৃতি শব্দ তো দক্ষিণদেশে কোনো কোনো মানুষের পদবি। তাঁরা কি তাঁদের পদবি বাদ দিতে রাজি হবেন? না-হলে, তাঁদের কারও নাম বাংলায় লিখতে গেলেই শব্দটি আবার বাংলায় ঢুকে পড়বে। আর, শব্দগুলি সংস্কৃত-শব্দ বা তৎসম-শব্দ ব'লেই যদি তাদের তাড়িয়ে দিতে হয়, তা হলে তো আরও মুশকিল! সাধারণভাবে মুসলিম, খ্রিস্টান, আদিবাসী বাদে প্রায় সব বাঙালির নামই তো সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ থেকে নির্মলেন্দু গুণ পর্যন্ত কার নামটি 'অসংস্কৃত'? সুনীলবাবু কি সংস্কৃত-শব্দ হওয়ার অভিযোগে তাঁর 'সুনীল' বা 'গঙ্গোপাধ্যায়'৮ বাদ দিতে রাজি হবেন? না কি 'নামের কোনো অর্থ নেই' এই যুক্তিতে রেখে দেবেন? আর, যদি-বা রাজিই হন, বাদ দেওয়ার পরেই তিনি শনৈঃ শনৈঃ টের পাবেন, 'সংস্কৃতের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা' ছিল কি না, এবং থাকলে কতখানি ছিল। দাঁত থাকতে তো দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না! দ্বিতীয় কথা হল, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলতে তিনি কেবল penis I vagina বুঝে কষ্ট পান কেন? তিনি বলবেন, বাংলাভাষায় এখন শব্দদুটির ওইরকম অর্থই প্রচলিত। অন্তত একালের স্কুলকলেজ-পড়া বাঙালিদের অনেকে এরকমই বোঝেন। কারণ, শিক্ষক-অধ্যাপকরাও তা-ই বোঝেন (কারণ, তাঁদের সব বিদ্যেই তো ইউরোপ -আমেরিকা থেকে শেখা), সেরকমই শিক্ষা দেন। সুনীলবাবুও সেরকমই বুঝেছেন, তাঁর দোষ নেই। কিন্তু সমগ্র বাঙালি জনসাধারণ যে সেরকম বোঝেন না, এবং বুঝে কষ্ট পান না, সেকথা নিশ্চিত। কেননা, তা হলে বঙ্গদেশে লিঙ্গপূজাই উঠে যেত, শিবরাত্রি উঠে যেত, শিবলিঙ্গে জলঢালা দুধঢালা বন্ধ হয়ে যেত। নিষিদ্ধ হয়ে যেত লিঙ্গপুরাণ। লিঙ্গদেবের মন্দির, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, লিঙ্গপীঠ, লিঙ্গার্চ্চন, লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়, সবই উঠে যেত। এখনও বলতে গেলে বহু বাঙালির জীবনের অঙ্গ এই লিঙ্গপূজা। আর সেটা সম্ভব হয়েছে শব্দটির অন্য অর্থ আছে বলেই। তার মানে, লিঙ্গ শব্দটি শুনলে সকল ভারতীয়ের বা সকল বাঙালির মনে penis-vagina-র ছবি আসে না। এমন কিছুর ছবি আসে, যা শোভন, রুচিসম্মত ও শ্রদ্ধেয়। প্রশ্ন হল : সে কীসের ছবি? বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ভারতে যত অভিধান লেখা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলি সংগ্রহ করে সেগুলির ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদপুষ্ট শ্রীহরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৩৬ বছরের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থটি রচনা করেন। তাতে 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সবার আগে যে অর্থটি দিয়েছেন, তা হল 'জ্ঞানসাধন'। তার মানে 'যার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়' (means of knowledge! মার্কসের মতে সেটাই তো means of production!) তাকে 'লিঙ্গ' বলে। এবং এই অর্থটি শ্রীহরিচরণের স্বকল্পিত নয়, ভারতীয় শব্দতত্ত্বের পূর্বাচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি ওই অর্থ দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ বহু প্রাচীন কাল থেকে 'লিঙ্গ' শব্দের ওইরূপ অর্থ প্রচলিত হয়ে আসছে। হ্যাঁ, দুই বাংলার ভাষাবিদরা প্রায় সকলেই জানেন, উপরোক্ত কথাটি ঠিক। কিন্তু সেকথা তাঁর শিক্ষক-অধ্যাপকদের বলে দেননি। বললে তো তাঁরা ছাত্রদের সেকথা শেখাতে পারতেন! বলেননি। কারণ, সেই ভাষাবিদরা নিজেরাই জানেন না, কেন 'যার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়' তাকে লিঙ্গ বলে। তাই তাঁরা চেপে যান, চেপে গেছেন, এবং পরবর্তীকালের আধুনিক অভিধান থেকে শব্দটির ওই অর্থটিকেও বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কারণ অভিধানের ওসব কথার প্রকৃত অর্থ তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেননি। তা ছাড়া তাঁদের বিশ্বাসও হয়নি। সত্যিই তো, কোথায় penis আর কোথায় means of knowledge! অবিশ্বাস্য! সুনীলবাবু কী আর করবেন, শিং-লেজওয়ালা বিশেষজ্ঞদেরই যখন এই হাল! যাই হোক, সম্প্রতি আমরা জেনেছি যে, বঙ্গীয় শব্দকোষের উপরোক্ত কথাটি শতকরা একশো ভাগই ঠিক–লিঙ্গই জ্ঞানসাধন। একালের কোয়ান্টাম-বিদ্যা সেকথা পুনরায় সপ্রমাণ করেছে। বস্তুত মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় বা 'জানালা' থাকলেও জগৎ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানই হতে পারে না, যদি-না সেই জগৎ থেকে কিছু বেরিয়ে মানুষের মনের ওই পাঁচটি 'জানালা' দিয়ে তার মনে প্রবেশ করে। আর, বস্তুজগৎ থেকে কিছু বেরিয়ে আসে কখন? যখন আমরা আমাদের লিঙ্গের ('লীন হওয়ার জন্য যে যায়' সেই লিঙ্গ, একালের কোয়ান্টাম-বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি যার নাম দিয়েছেন participator, তার) সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোজিত হই। যোজিত হলেই তারা প্রতিক্রিয়া 'জনন' করে, সেই 'জনন-সংবাদ'কেই 'জানা' বলে, সেই 'জানা' মনের 'জানালা' দিয়ে আমাদের মনে প্রবেশ করে ব'লে আমরা 'জানতে' পারি। বস্তুজগতের কোটি কোটি 'জনিত-প্রতিক্রিয়া'ই আমাদের 'জানা' বা 'জ্ঞ' বা 'জ্ঞান'। এভাবে কোনো কিছু 'জনিত হওয়া'র বা 'হওয়া'র সংবাদ যে বহন করে আনে, তাকে তাই 'হওয়া-র আধার' বা 'হাওয়া' বলে। যেখান দিয়ে সেই হাওয়া ওই জনন-সংবাদ বা 'জানা'কে নিয়ে আমাদের মনে প্রবেশ করে তাকে তাই 'জানা-লা' বলে। বাংলা 'জানালা' শব্দের মানে তাই window-মাত্র নয়, এর প্রকৃত অর্থ 'জানা-রূপ অভীষ্টদান করে যে', entrance of knowledge বললে খানিকটা ঠিক বলা হয়। অর্থাৎ মনের জানালা কথাটি রূপক নয়। রূপক নয় শিবলিঙ্গও।৯ রূপক নয় লিঙ্গশব্দযুক্ত অন্যান্য শব্দগুলিও। কারণ, 'লীন হওয়ার জন্য যে গমন করে', সেই-ই লিঙ্গ-পদবাচ্য; হতে পারে সে penis, participator, theory, language, ... এরকম অনেক কিছুই। আপনি সর্বাগ্রে এবং সবসময় 'বেঁড়ে ব্যাটাকেই ধর' ব'লে তেড়ে যাবেন কেন? যত দোষ নন্দ ঘোষ! কেন, বাকিরা কি 'গমন' করে না? (তবে হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন–আমি তো উত্তম-অধিকারী নই, নিম্ন-অধিকারী। সার্বিক অর্থ যাতে না-বুঝতে পারি, যাতে কেবল নিম্ন-অর্থই বুঝতে পারি, সে-কল তো আমাদের মহান ভারতে আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা অনেক কাল আগে থেকেই করে রেখে গেছেন। আমরা অনেকেই যে তারই শিকার। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। বলতে

পারেন, প্রপিতামহের প্রপিতামহের... প্রপিতামহ শূদ্র-ম্লেচ্ছদের জন্য গর্ত খুঁড়েছিলেন, জানতেন না সেখানে তাঁর নিজের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের... প্রপৌত্রও পড়ে যেতে পারে! এখন যখন পড়েই গেছেন, প্রপিতামহদের ওপর অভিমান করে কী আর হবে! ওঠার চেষ্টা করুন! হাত ধরার লোকের অভাব হবে না।) তার মানে, প্রাচীন মানুষের অভ্যাসে একটি শব্দের সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট কর্তার ছবি মনে ভেসে আসার প্রক্রিয়াটি কাজ করত না। ভেসে আসত এক 'সক্রিয় ক্রিয়াকারী'র ছবি, যা দেখতে কেমন হবে তা নির্ভর করত শব্দটির প্রয়োগের প্রেক্ষাপট অনুসারে। আজকের বিচারে সেই শব্দকে মনে হতে পারে বহু অর্থবাচক, সেকালে কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক ছিল। আর, এটাই মানুষের আদি ভাষা বিষয়ে নেচারের নিজস্ব নিয়ম (সর্বনাম শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বহু-অর্থবাচকতা এখনও প্রায় সব ভাষাতেই প্রচলিত), যে-নিয়ম সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ সন্তান বিধায় বাংলারও হস্তগত। হিন্দি প্রভৃতি সংস্কৃতজ ভাষারও এই উত্তরাধিকার কমবেশি আছে। আমাদের কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাশের মতো তাঁদেরও তুলসীদাস জন্মেছিলেন। সেকারণেই হিন্দিভাষাভাষী সাধুসন্তদের নিকট এখনও শোনা যায় 'ভগ্‌মে লিংগ্‌, লিংগ্‌মে পারা, যো বুঝে সো গুরু হমারা'। এই বাক্যের নিম্ন-অধিকারীসুলভ অর্থ তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু উত্তম-অধিকারীসুলভ অর্থ বোঝা একালে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রাচীন বাংলায় অনুবাদ করলে উক্ত হিন্দি বয়ানটির বঙ্গানুবাদ হয়–'ব্রহ্মযোনিতে অমৃতলিঙ্গ, অমৃতলিঙ্গে অমৃত, একথার অর্থ যে বোঝে সেই আমাদের গুরু।' আর ওই বাক্যটিকে আপডেট করে নিলে মানে দাঁড়ায়–'কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রযুক্তিতে নতুন আবিষ্কারের (তত্ত্বের/theory) প্রয়োগ, একথার অর্থ যে বোঝে সে আমাদের গুরুস্থানীয়'। একালে এইরকম গুরুর এক নাম হয়েছে ম্যানেজমেন্ট-গুরু। আদিকালে এঁদের বলা হত 'মহর্ষি'। ... মোট কথা বাংলাভাষার ও বাঙালি সংস্কৃতির এক বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা তার সংবাদ রাখি আর না-ই রাখি। এর পরও যদি সন্দেহ হয়, দূরে যেতে হবে না। ওই 'জ্ঞান'সাধনের 'জ্ঞ' শব্দের ইতিহাসে গেলেই বাকিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বাংলায় 'জ্' মানেই 'জনন'। তার সঙ্গে 'ঞ' ও 'অ' যোগ করে 'জ্ঞ' কথাটি বানানো (যেমন বিশেষ'জ্ঞ')। 'জ্ঞ' কথাটিকে ইংরেজিতে লিখতে চেষ্টা করুন, পাবেন gno। ইংরেজি ভাষা যে-ভাষা থেকে জন্মেছে তারই ভগিনীপ্রতিম ল্যাটিন ভাষায় এই gno-যুক্ত শব্দ বিদ্যমান রয়েছে [(g)noscere] এবং সেটি জ্ঞানের প্রতিশব্দ। কেবল তা-ই নয়, তাতে জননের অর্থটিও বিদ্যমান। ইংরেজি ভাষাতে সেটিই kno ev know-তে পরিণত হয়েছে। g-এর বদলে k। তাতেও সেকালে জননের অর্থটি ছিল। বাইবেলে know শব্দটি 'জনন করা' (means of production=means of knowledge) অর্থে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে, আমাদের 'জ্ঞ' আর ইংরেজের know একই আদি ভাষার দুই উত্তরাধিকার। উত্তরাধিকার বলেই উচ্চারণহীন k বর্ণটিকে know শব্দের সঙ্গে ইংরাজ জাতি হাজার বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে, আজও বইছে। কেন যে বইছে, ইতিহাসের মারে তাঁদের মহাপণ্ডিতেরাও আজ সেকথা জানেন না। জিন-সম্পর্ক একেই বলে! তা সে যা-ই হোক, কথাটি এই দাঁড়াল যে, বাংলাভাষার ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ ও সাধুভাষা নামে বিপুল ঐশ্বর্যের এক মহাভাণ্ডার রয়েছে। কপালগুণে আমরা বাংলাভাষাভাষীরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই মহাভাণ্ডারের মহাসম্পদের অধিকারী। বানানের সমতাবিধানের আড়ালে ভাষা-সংস্কারের নামে সেই মহাসম্পদ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাধা তো আসবেই, এবং আসছেও। এমনকি ঘুমন্ত বঙ্গমানসও এই

চেষ্টা সহ্য করবে বলে মনে হয় না। আর যতদূর বুঝেছি, বঙ্গমানসের 'অলাতশান্তি-প্রকরণের' বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও সে কালনিদ্রায় এখনও ডুবে যায়নি। আর, সেজন্যেই বাংলাভাষার এই 'প্রয়োজনীয় সংস্কার' করা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সত্য আজ অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলাভাষার অতীত, তার সংস্কৃত উত্তরাধিকার, বাংলাভাষার জীবনে একসময় শৃঙ্খলারূপে কাজ করত, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, যাঁরা সেই মহাভাণ্ডারের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা রহস্যজনকভাবে সেই মহাভাণ্ডারের গর্ভগৃহের পথটাই হারিয়ে বসে আছেন, যে-গর্ভগৃহে সঞ্চিত রয়েছে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত আমাদের সেই মহা-সম্পদ। ফলে, মহাভাণ্ডারটি এখন খানিকটা পরিত্যক্ত কেল্লার মতো। এখন সেখানে ভূত, প্রেত, ধর্মধ্বজী কাপালিক ও অসামাজিক প্রাণীদের অবাধ রাজত্ব চলছে। তারই মধ্যে বাংলাভাষাকে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, কেল্লাটির যে-প্রাচীন শাসনব্যবস্থা এখনও টিকে রয়েছে, বাংলাভাষাকে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সেই শাসনব্যবস্থারই হুকুম তামিল করতে হচ্ছে। মানতে হচ্ছে পুরোনো সেকেলে রীতিরেওয়াজ, যদিও পুরোনো সম্পদ উদ্ধার করে তাকে encash করাও যাচ্ছে না; ফলে, দারিদ্র্যও ঘুচছে না। ওদিকে বাইরের দুনিয়া এগিয়ে চলেছে, ঘরে বারণ থাকার কারণে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপডেটেড হয়ে পড়াও যাচ্ছে না। স্বভাবতই সমগ্র পরিস্থিতি বাংলাভাষার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে—জমিদারি চলে যাওয়ার পর জমিদারের তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরসূরির 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' করতে গিয়ে যে-অসহনীয় পরিস্থিতি হতে আমরা কখনও-সখনো দেখেছি, বাংলাভাষার অবস্থা এখন অনেকটা সেরকমই। প্রপিতামহদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস তাঁদের জীবনে হয়তো শৃঙ্খলা এনেছিল, কিন্তু প্রপৌত্রদের জীবনে এখন সে শৃঙ্খলরূপে চেপে বসেছে।

সুনীলবাবুরা বাংলা ভাষার এই শৃঙ্খলমুক্তির কথাই বলেছেন। আর সেজন্যই তাঁরা সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ ও সাধু শব্দকে বাদ দিয়ে নিখাদ বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠার পক্ষে ওকালতি করছেন। প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত কেল্লার ভুতুড়ে প্রাসাদের বাইরে মেইন-রোডের সামনে পায়রা-খোপের মতো নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে রবীন্দ্রোত্তর বাঙালিসমাজ। কিন্তু এখনও, সে-বাড়িতেও, কেল্লার সেই পুরনো নিয়মই চলছে। সুনীলবাবুরা বলছেন—তা চলবে না, আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির নিজস্ব নিয়ম চাই। 'সেজন্যই তো বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা অবিলম্বে অতি প্রয়োজনীয়' বলে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। মোট কথা, বানানের সমতাবিধান করতে গেলে আটকাচ্ছে বাংলার অতীত, বাংলাভাষার ওপর চেপে বসে থাকা সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম। সংসারের সব দায় সামলাবেন বউমা, কিন্তু সেই দায় সামলাতে গিয়ে কোনো কিছু তিনি সহজ সরল করে নিজের সুবিধামতো করে নিতে পারবেন না। তিনি যা-ই করুন, তাঁর ক্রিয়াগুলিকে অবশ্যই শাশুড়ির (সংস্কৃত ব্যাকরণের) দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। অন্যথায় শাশুড়ি রেগে যাবেন। তাই বলে শাশুড়ি কিন্তু তাঁর সিন্দুকের চাবি খুলে পুরুষানুক্রমে গচ্ছিত ধনরত্ন বের করে বউমাকে দিতেও পারবেন না। দিলে, বউমা তো সংসার সামলাতে এমন জেরবার হতেন না, বাইরের মুখাপেক্ষীও তাঁকে হতে হত না, উলটে দুনিয়া তাঁরই মুখাপেক্ষী হত। কারণ শাশুড়ি মহাশয়া তাঁর সিন্দুকের চাবিটাই হারিয়ে ফেলেছেন এবং সেকথা কাউকে তিনি জানতেও দেননি। ...বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত বিবাদ এখন এভাবেই শাশুড়ি-বউয়ের মহৎ কাজিয়ায় পরিণত হয়েছে। এই কাজিয়া১০ চললে ভাষা-সংস্কার হবে কীভাবে?

চার

ভাষা-সংস্কার নিয়ে কাজিয়ার মূলে কী রয়েছে? এসব প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলা দরকার, যে-জায়গাটিতে হাত দিয়ে সুনীলবাবু তাঁর 'কবিমানসের' ব্যাখ্যা করেছেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সেখান থেকে ভাষা নিয়ে এবম্প্রকার যত সমস্যা, তার একেবারে মূলাধারে পৌঁছনো যায় এবং উপরোক্ত সমস্যার রহস্য ও সমাধান-সূত্র বের করে আনা যায়। সুনীলবাবু বলেছেন–'সব শব্দই এক একটি ছবি আনে আমাদের মানসে, যেমন আকাশ, যেমন নদী, যেমন হরিণ ইত্যাদি।' ভালো করে ভেবে দেখুন তো, হরিণ বললে যে-ছবিটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে সেটি 'হরিণ' মাত্র, নাকি 'হরিণ চরছে', বা 'হরিণ ছুটছে', 'হরিণ তাকিয়ে আছে'–এই-জাতীয় কি না? 'আকাশ' বললে শুধুই 'আকাশ' দেখি, নাকি 'আকাশ আছে' বা 'আকাশ শোভা পাচ্ছে' দেখি? নদী বললেই-বা ঠিক কীরকম ছবি মাথার ভিতরে দেখা দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরই হল সর্বভাষার একেবারে গোড়াকার প্রশ্ন। নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নের উত্তর হল, আমরা 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারীকে' দেখি। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উত্তরও তা-ই।১১ সে-মতে জগৎ থেকে 'সম্পর্কহীন' ক্রিয়াহীন' কোনোও সত্তা হয় না, সেরকম কাউকে আমরা দেখি না, দেখতে পারি না। কোনোও ক্রিয়া না-থাকলে 'থাকা' ক্রিয়া থাকবেই। অস্তিত্ববানই নয়, এমন কাউকে কি আমরা দেখতে পাই? সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কাউকে দেখবার কোনোরকম শক্তি নেচার আমাদের এখনও দেয়নি। দিলে, খোদ দোজাহানের মালিক পরমেশ্বরকে কবেই আমরা সম্পূর্ণ পকেটস্থ করে ফেলতাম! কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাষাতাত্ত্বিকদের এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় শিক্ষিতজনদের উত্তর অন্য। প্লেটো-সক্রেটিসের আমল থেকেই তাঁদের ওইরকম 'অন্য উত্তর' দেওয়ার প্রথার প্রচলন হয়। পরে হারুন-অর-রশিদের বাগদাদী সভ্যতায় সেইরকম ধারণার আরও বিকাশ ঘটে। তাঁরা মনে করেন, আকাশ নদী হরিণ বললে আমরা নিষ্ক্রিয় আকাশ নদী হরিণই দেখি। এইজন্য তাঁদের ভাষার স্বভাবের সঙ্গে আমাদের ভাষার স্বভাবের মিল নেই। তাই তাঁদের ভাষাসমূহ বিশেষ্যভিত্তিক বা প্রতীকী, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বেশির ভাগ ভাষাই মূলত ক্রিয়াভিত্তিক। বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় এক শব্দের একটিই অর্থ হয়, কদাচিৎ দুটি এবং অর্থটিকে খুঁজতে হয় শব্দের বাইরে। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় এক শব্দের বহু অর্থ হয়, কদাচিৎ একটি দুটি এবং অর্থগুলিকে খুঁজতে হয় শব্দের গলায় শোভমান মালার নামগুলিতে। তাই, বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় সম্পূর্ণ-অভ্যস্ত মানুষ ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাকে কিছুতেই বুঝতে পারে না, ভেবে পায় না, এক শব্দের বহু অর্থ হলে সে ভাববিনিময়ের কাজ চালাবে কেমন করে! আল-বিরুণী ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসে সংস্কৃতভাষার বিরুদ্ধে তো এই অভিযোগই তুলেছিলেন।১২ আর, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে (তৎসম শব্দের কারণে) সে-অভিযোগ তো রয়েছেই, বাড়তি অভিযোগ হল, তার একটি শব্দের বানানও বহুরকমের! এরকম হল কেন? ভাষার মূল চরিত্র, ভারতীয় উপমহাদেশে ও তার বাইরে দু'রকম হয়ে গেল কেন? কীভাবেই-বা এর থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি? যতদূর বোঝা যায়, মানুষের আদিভাষার ভিত্তিতেই ছিল ওই ক্রিয়াভিত্তিক দর্শন। তারই ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষের আদি মহাভাষা গড়ে উঠেছিল। তাতে কোনো বর্ণই অর্থহীন ছিল না; বর্ণেরা 'ক্রিয়াকারী'কে চিহ্নিত করত। কয়েকটি বর্ণ নিয়ে যে-শব্দ তৈরি হত, সেই শব্দের গলায় থাকত এক বা একাধিক ক্রিয়ার একটি সুতোর মালা, মালাতে গাঁথা থাকত কতকগুলি নামের ফলক, প্রতিটি ফলকের নামই ওই শব্দের উদ্দিষ্ট (reference)

হত। প্রেক্ষাপট অনুসারে ঠিক হত শব্দটি তার গলার মালার ভিতর থেকে কোন ফলকের নামটিকে তুলে দেখাবে। সেই অনুযায়ী গোটা বাক্যটির মানে হত। এই ছিল আদি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার স্বভাব। এমনকি পুরাণকথিত দক্ষযজ্ঞ-কাণ্ডের পর, বা মহাপ্রলয়ের পর, কিংবা বাইবেল-কথিত বেবেল-কাণ্ডের পরে আদি-মহামানবসমাজ যখন বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি সমাজখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল, তখনও প্রতিটি খণ্ডসমাজের ভাষা ছিল এইরকম কমবেশি ক্রিয়াভিত্তিক। কিন্তু ওই মহাপ্রলয়ের মহাতাণ্ডবে বিপর্যস্ত দর্শন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুর ওপর দিয়ে যেমন ঝড় বয়ে গিয়েছিল, ভাষার ওপর দিয়েও তেমনি ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ফল হয় এই যে, বহু শব্দের গলার মালা ছিঁড়ে যায়, কোনো কোনো শব্দের গলায় দেখা যায় নামহীন সুতোটাই ঝুলে রয়েছে,১৩ কারও-বা মালা রয়েছে বটে কিন্তু তাতে মাত্র একটি বা দুটি নামের ফলক, কোনো কোনো শব্দ সুতোসহ মালা খুইয়ে কেবল একটি বা দুটি ফলক হাতে ধরে হতভম্ব দাঁড়িয়ে। আদি সমাজখণ্ডগুলির প্রত্যেকের ভাষার চরিত্র তখন অনেকটা এইরকম। ২০০০–১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীতে যে-কয়টি জাতি বিরাজ করত তাদের সকলের ভাষাই ছিল কমবেশি এরকম–ভারতীয় উপমহাদেশেরও। এদিকে, সমাজে পণ্যের উদ্ভব ও বিকাশ যত বেশি হবে এবং ব্যক্তিমালিকানা যত বিকশিত হবে, ততই সমাজের ভাষাও তার ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাব ত্যাগ করে ক্রমে বিশেষ্যভিত্তিক হয়ে যাবে–এইরকম একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচলিত থাকার ফলে সেই সকল ভাষা ক্রমান্বয়ে বিশেষ্যভিত্তিক (প্রতীকী/লোগোসেন্ট্রিক) ভাষার দিকে মোড় নিতে থাকে। কয়েকশো বছর পরে ভারতে পৃথিবীর আদি রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর, সেকালের জ্ঞানীগুণী ভারতীয়রা, ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত, ততদিনে-খানিকটা-অধঃপতিত-ভাষাকে মানুষের ভাষার ফেলে-আসা সেই আদি নিয়ম যথাসম্ভব স্মরণ ও অনুসরণ করে 'সংস্কার' করে নিয়ে 'সংস্কৃত' ভাষার সৃজন করেন। প্রতিটি শব্দের গলার মালার ফলকগুলিকে পুনরুদ্ধার করে যথাবিহিত ক্রিয়ার সুতোয় গেঁথে পুনরায়, যে-শব্দের যে-মালা সেই শব্দের গলায় সেই মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, সংস্কৃতভাষা সেকালের শিক্ষিতমহলের সেই ভাষা হয়ে যায়, যার ভিতরে আদিম মানুষের আদি ভাষার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক গুণাবলি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সংহত, যা আজও অনেকটা শব-আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সাধারণ মানুষ কিন্তু পিছনে হেঁটে সেই কৃত্রিম সংস্কৃতভাষাটি বিশেষ রপ্ত করেনি। তাই সেই সংস্কৃতের যা-কিছু ব্যবহার চলে, তার সবটাই চলে সেকালের শিক্ষিতমহলে। ওদিকে পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি তাদের অধঃপতিত ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাকে সেই আদি নিয়মে সংস্কার করে উঠতেই পারেনি। তবে অনেকদিন পর্যন্ত সেই আদি ভাষার কিছুকিছু স্বভাব ধরে রেখেছিল ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক ও প্রাচীন-হিব্রু প্রভৃতি ভাষা (সংস্কৃতের সঙ্গে সেই কারণে এদের এত মিল)–আধুনিক-গ্রিক বা আধুনিক-হিব্রু নয়। যাই হোক, ক্রমে সব সমাজেই পণ্য ও ব্যক্তিমালিকানা যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেই পরিমাণে মানুষের মুখের ভাষার শব্দ এগোচ্ছিল বিশেষ্যভিত্তিক স্বভাবের দিকে–শব্দ মাত্রেই তার হাতের ফলক, গলার সুতো যেটুকু যা সম্বল ছিল, সেটিকে লোগোর (logo-র) মতো ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলত সব দেশের ভাষাই ক্রমশ 'লোগোসেন্ট্রিক' (প্রতীকী) হয়ে যেতে লাগল, ভারতেরও। ৬০০ ও ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাস্ক ও পাণিনি পুনরায় সংস্কৃতভাষার স্বরূপটিকে রক্ষার চেষ্টা করলেন বিশ্বের আদি অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করে। ভারতের ভাষা-

ব্যবহার জনসাধারণ্যে শনৈঃ শনৈঃ প্রতীকী ভাষার দিকে এগোলেও শিক্ষিতমহলের ভাষা কঠোরভাবে ক্রিয়াভিত্তিক অনুশাসন মানতে শুরু করে। এইভাবে ভারতে শিক্ষিত মানুষ ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে একটা 'মহল বিভাগ'১৪ হয়ে যায়, এবং সেভাবেই চলতে থাকে। ওদিকে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ক্রিয়াভিত্তিক আদি ভাষাকে ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় মানুষের মুখের ভাষা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল প্রতীকী ভাষার দিকে। সবশেষে, শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ক'রে ইউরোপ ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে নিল। যে-শব্দের হাতে একটি ফলক ছিল, সেই ফলকটির নামকেই সেই শব্দের logo করে দেওয়া হয়। যে-শব্দের গলায় সুতোটুকু সম্বল ছিল, সেই শব্দের বেলায় সুতোর নামটিকেই শব্দটির logo করে দেওয়া হয়। অনেক শব্দের বেলায় নতুন একটি logo টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ফলত, তাদের ভাষা হয়ে গেল এমন শব্দের ভাণ্ডার, যার প্রতিটি শব্দের পিঠে একটি টোকেন বা লোগো লাগানো, যে-টোকেন দেখে বোঝা যায় শব্দটি কাকে উদ্দেশ (refer) করছে। ক্রমে তাদের দেশের সমস্ত ভাষাই সম্পূর্ণরূপে বিশেষ্যভিত্তিক (লোগোসেন্ট্রিক/প্রতীকী) হয়ে এক শব্দের এক অর্থবাচক হয়ে গেল (যদিও আদি ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষাগুলির 'জিন-সম্পর্ক' এখনও কিছু-কিছু বিদ্যমান রয়েছে)। কেবল তা-ই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবী দখল করলে পর, সারা পৃথিবীর ভাষাগুলিই ইংরেজি প্রভৃতি লোগোসেন্ট্রিক ভাষার স্বভাবের দ্বারা বিকশিত (সংস্কৃতভাষার চোখে কলুষিত) হয়ে যায়।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে সেরকম হয়নি। পণ্য ও ব্যক্তিমালিকানার বিকাশের সমান্তরালে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষার দিকে যাওয়ার ঝোঁক ক্রমশ বাড়লেও (বিশেষত বৌদ্ধ যুগে), হিন্দুযুগের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) সূত্রপাতের পর থেকে শিক্ষার দুনিয়ার সংস্কৃতভাষা অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসৃত হতে থাকে, যদিও জনসাধারণের ভাষাকে পেছনে টেনে ধরা যায় না। ফলত দুই ভাষার মধ্যে বিস্তর ফারাক ঘটে যায়। তার ওপর, এরই ভিতর একদিন সংস্কৃতের ঔরসে আঞ্চলিক মানুষের অধঃপতিত (মাগধী) ভাষার গর্ভে ক্রিয়াভিত্তিক সংস্কৃতভাষার সুযোগ্য সন্তানরূপে বাংলাভাষার জন্ম হয় এবং বিস্ময়কর ঘটনা হল, বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাতের পরে, সেই ভাষা হাতে নিয়ে হাজির হন দুই মহাকবি–কাশীরাম দাশ ও কৃত্তিবাস ওঝা। বঙ্গদেশে শিক্ষিতমহলে সংস্কৃত ও বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবের বিশেষ্যভিত্তিক রূপান্তরণ তখনও মনে হয় ২০/৩০ শতাংশের বেশি হয়নি। আর দর্শন ও সংস্কৃতি তখনও বলতে গেলে ১০০ ভাগই ক্রিয়াভিত্তিক। সেই ১০০ শতাংশ ক্রিয়াভিত্তিক দর্শন ও ক্রিয়াভিত্তিক সংস্কৃতি মাথায় নিয়ে প্রধানত ক্রিয়াভিত্তিক ও অংশত বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত লিখে ফেলেন এই দুই মহাকবি। বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক বনেদ তৈরি হয়ে যায়। তারপর আসে বিপুল মঙ্গলকাব্যের ধারা, আসেন শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬–১৫৩৩), আসে পদাবলী সাহিত্যের ধারা, মুসলমানদের বাংলা রচনাবলি, আসেন পীর-আউলিয়ারা, আউল-বাউলেরা। সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলাভাষাও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রিসের 'হমর'-কথিত ইলিয়ড ওডিসি, সংস্কৃতের বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসকৃত মহাভারত এবং বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত একই ক্রিয়াভিত্তিক-দর্শন-সংস্কৃতি-ভাষার বিশেষ বিশেষ দেশ-কালের যমজ সন্তান। এগুলির প্রত্যেকটিই কমবেশি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা মানবসভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস। এগুলির যথার্থ অর্থ কেবলমাত্র ক্রিয়াভিত্তিক-দর্শন-সংস্কৃতি-

ভাষার সাহায্যেই বোধগম্য, বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা দিয়ে তার প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। তাই, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত আছে, কিন্তু আমরা তার মানে বুঝি না।১৫ সুনীলবাবু কোন ছার, ওগুলির মানে বোঝেন এমন একজন বাঙালি পণ্ডিতও এখন জীবিত নেই। কেবল একজন মানুষ 'খানিকটা' অনুভব করেছিলেন, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।১৬ তাই তিনি বারংবার লিখে গেছেন–'রামায়ণ মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস।' তবে তাঁর সেকথায় কি রবীন্দ্রানুরাগী কি রবীন্দ্রবিরোধী, কোনো শিল্পী-সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক কান দেওয়া উচিত বলে বিবেচনা করেননি। আশ্চর্য রবীন্দ্রভক্তি! আশ্চর্য রবীন্দ্রবিরোধিতা!

ইংরেজ যখন ভারতে এসে হাজির হল, তখন নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া তাদের সমীহ করেনি, করেছিলেন পতিত ও দুঃস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ আতরফরা। সেই দুঃস্থ ব্রাহ্মণেরা আগন্তুক এই নতুন ভাষার লোকেদের বুঝতে চাইলেন নিজেদের স্বভাব দিয়ে। কিন্তু সে তো হবার নয়। দুটো ভাষার স্বভাব যে একেবারেই আলাদা। সেই কারণে ইংরেজি ও ফারসিকে (আরবি-উর্দুকেও) যতটা সহজে পরস্পরে অনুবাদ করা যাচ্ছিল, ততটা সহজে ইংরেজি ও বাংলাকে পরস্পরে অনুবাদ করা যাচ্ছিল না। কেরি সাহেবের সহকারীরা সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের আগে পর্যন্ত কাজটা কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছিল না। বলতে গেলে তখনও 'জন্তু'কে Gentoo-তে, Respondentia Bond-কে 'রসপিঞ্জরী'তে অনুবাদ করা চলছে। তখনও বাঙালি পণ্ডিত তাঁর ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাবোধের ভিতরে থেকেই ইংরেজিভাষার ভিতরে যেটুকু আদি ভাষার জিন-সম্পর্কের সন্ধান পাচ্ছিলেন, তাকে খুঁজে খুঁজে দুটোকে মেলানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বোঝা যায়নি যে, দুটোকে মেলানোর যুগ ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর শেষ হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর ও রামমোহন (দুজনই 'শব্দসংগ্রহ', 'বাংলা ব্যাকরণ' নিয়ে কাজ করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন) এসে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাকে বিশেষ্যভিত্তিক (প্রতীকী) উপায়ে ব্যবহার করার উপায়টি নিশ্চয়তার সঙ্গে প্রয়োগ করলেন। ব্যক্তিমালিকানার যথেষ্ট বিকাশ ঘটে যাওয়ায় লৌকিক বাংলাভাষা ইতোমধ্যেই অনেকখানি বিশেষ্যভিত্তিক ভাষার দিকে মোড় নিয়ে ফেলেছিল। লোকে তাদের ভাষা-ব্যবহারে বাংলা শব্দের গলার মালার ব্যবহার না-করে মালার একটিমাত্র ফলককেই শব্দের উদ্দেশ (reference) রূপে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যদিও লিখিত কৃত্তিবাসী বাংলাভাষা তখনও কিছুতেই নতুন যুগে পা রাখতে পারছিল না। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা, কেউ খানিকটা জ্ঞাতসারে বা কেউ-বা অজ্ঞাতসারে, শব্দের গলার মালাটি একটি থলিতে পুরে, থলির মুখ বেঁধে দিয়ে, মালার যে-ফলকটির নামটি লৌকিক ব্যবহারে বারংবার ব্যবহৃত হচ্ছিল শব্দটির উদ্দিষ্টরূপে, সেই নামটি একটি টোকেনে লিখে থলির উপরে সাঁটিয়ে থলিটি শব্দের পিঠে ঝুলিয়ে দিলেন। বাংলাভাষার শব্দেরা থাকল প্রায় আগের মতোই–আগে তাদের প্রত্যেকের গলায় নিজ নিজ মালা ছিল, এখন মালাটি রইল থলিতে, থলিটি রইল পিঠে, তার উপর একটি টোকেনে লেখা রইল থলিতে কী ফলক রয়েছে, সেগুলির মাত্র একটির, কদাচিৎ দুটির নাম। শব্দটি সেই লোগোটির অর্থবাহক রূপে সক্রিয় হয়ে গেল। ফলত, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের এইরূপ 'ব্যবহার-প্রক্রিয়া' শব্দগুলিকে বিশেষ্যভিত্তিক (প্রতীকী) শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপায় করে দিল। অর্থাৎ বাংলাভাষার শব্দেরা রইল আগের মতোই ক্রিয়াভিত্তিক কিন্তু তার ব্যবহার হয়ে গেল লোগোসেন্ট্রিক (প্রতীকী)। ইংরেজির সঙ্গে লেনদেনে আর কোনো অসুবিধাই রইল না।

এতে সুবিধা হল এই যে, অতীত থেকে গেল শব্দের ভিতর 'শায়িত' বা latent হয়ে, অথচ বর্তমানকেও সামলে নেওয়া গেল। কিন্তু এর ফলে, বাংলাভাষা হয়ে গেল বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রচলিত ভাষাগুলি থেকে আলাদা। অন্য সমস্ত ভাষার শব্দের কাঁধে একটি লোগো ঝোলানো থাকে, আর সে লোগোতে লেখা থাকে শব্দটির দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের নাম। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে দেখা গেল, শব্দের কাঁধে রয়েছে একটি মুখবাঁধা থলি, সেই থলির উপরে লটকে দেওয়া হয়েছে একটি লোগো, সেই লোগোতে রয়েছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের নাম। অর্থাৎ সব ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার শব্দের পার্থক্য ওই থলি বা পুঁটলি।

বাংলাভাষার বর্তমান সংস্কারকগণ বলছেন, ইংরেজির মতো বাংলারও, শব্দের উদ্দিষ্টকে যখন লোগোর সাহায্যেই চিনছি, শব্দ এবং শব্দের লোগোটি থাক, পুঁটলিটি ফেলে দেওয়া হোক। বাংলা শব্দেরা বেকার বেকার একটি করে পুঁটলি বয়ে বেড়াবে কেন? লাগেজ কম থাকা বা না-থাকাই একালের নিয়মে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে হিতকর। অতএব, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়ানোর দরকার কী!

কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা বাংলা তৎসম শব্দগুলিকে 'ভূতের বোঝা' বইবার নিদানই দিয়েছিলেন। এবং তাতেই সেসময় দুই কূল রক্ষা করা গিয়েছিল। তারপর বিদ্যাসাগর-রামমোহনের পিছুপিছু এলেন বঙ্কিমচন্দ্র, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী... এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথ। বাংলা শব্দ, শব্দের পিঠে থলি, থলির উপরে লোগো–এই নিয়েই এঁরা কাজ চালালেন। ঐতিহ্য (থলি) বজায় রেখে কীভাবে বাংলাভাষাকে তাঁর সময়ের মতো 'আপডেট' করা যায়, এঁদের কেউই সে-চেষ্টার কসুর করেননি। আর সেজন্যেই সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ ও সাধু শব্দসমূহকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার পরিকল্পনাও তাঁরা করেননি। অথচ ব্রিটিশ শাসনের এই নতুন প্রেক্ষিতে, যখন কাজকর্মের ভাষা বাংলা, যখন পাবলিক বাংলায় কথাবার্তা বলে, তখন শিক্ষিতের দুনিয়ায় কৃত্তিবাসী বাংলাভাষার 'সংস্কৃত-মুখ'টিকে সরিয়ে 'বাংলা-মুখ'টিকে সামনে আনাই ছিল যুক্তিযুক্ত এবং সে-ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মোট কথা বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, সবাই কীভাবে দুদিক রক্ষা করা যায়, অতীতও বজায় থাকে আবার দ্বারে সমাগত সময়কেও বুঝে নেওয়া যায়, তার জন্য যারপরনাই সচেষ্ট ছিলেন। মাকে তাড়িয়ে না-দিয়ে বউমার হাতে সংসারের দায়দায়িত্ব দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁরা এবং সফলও হয়েছিলেন।

তবে বলে রাখা ভালো, বিদ্যাসাগর (১৮৬০–১৮৮০) ও তাঁর সমসাময়িক মনীষীদের প্রচেষ্টার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (১৯২০–৪০) প্রচেষ্টার একটি স্পষ্ট পার্থক্য ছিল, সময়ের পার্থক্য ছিল প্রায় ৬০-৭০ বছরের। বিদ্যাসাগর যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা ছিল ভিন্ন। তখন ইংরাজশাসিত বাঙালির সংসারে যে-মেয়েটি বাংলাভাষা রূপে, বাড়ির ঝি-এর মতো সব দিক কমবেশি সামাল দিচ্ছিল, তার না-ছিল কোনো পরিচয়, না-ছিল সম্মান, হাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত নামে দু'খানি মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্যের সম্ভার ও হিন্দু-মুসলিম উভয়ের দ্বারা লালিত-পালিত বিশাল পদাবলীসাহিত্য ও সঙ্গীতের সম্ভার থাকা সত্ত্বেও। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা সেই গৌরবহীন বাংলাভাষাকে বাঙালির সংসারে বধূর সম্মান দেন, যদিও সংসারের চাবির গোছাটি রেখে দেন তার শাশুড়িমায়ের (সংস্কৃতের) আঁচলেই।১৭

আর, রবীন্দ্রনাথ যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন বাংলাভাষার নিজস্ব পরিচয় হয়ে গেছে, সম্মানও যথেষ্ট, সংসারে সে তখন প্রতিষ্ঠিত। তখন বিদ্যাসাগরের সেই বধূ-বাংলাই বাঙালির সংসারের সর্বময় কর্ত্রী, নোবেল হাতে নিয়ে সে বিশ্বসংসারের কাছেও সম্মানিত, কিন্তু তখনও তার হাতে সংসারের চাবির গোছাটি নেই। রবীন্দ্রনাথ শাশুড়িমায়ের হাত থেকে সসম্মানে চাবির গোছাটি নিয়ে বউমার হাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও বহু বাধার সম্মুখীন হয়ে কাজটিতে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। আজ বলা হচ্ছে, শাশুড়িমাকে তাঁর চাবির গোছাসুদ্ধ তাড়িয়ে দাও এবং চাবিওয়ালাকে ডেকে নতুন চাবির গোছা বানিয়ে (নতুন বাংলা ব্যাকরণ লিখে) বধূ-বাংলার হাতে তুলে দাও!

এমতাবস্থায় আমরা কী করব? আমরা কি বানানের সমতাবিধায়কদের এই দাবি মেনে নেব? পুনরায় রবীন্দ্রনাথের মতো উভয় কূল রক্ষা করার চেষ্টা করব? না কি অন্য কোনো উপায় আছে কি না, সেটি অনুসন্ধান করে দেখব? কী করব আমরা?

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের সময়ের সঙ্গে আমাদের সময়ের বিস্তর ফারাক ঘটে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাভাষা এখন কার্যত দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে–বিশেষ্যভিত্তিক (লোগোসেন্ট্রিক) বাংলাভাষা ও ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষা। যে-বাংলাভাষায় এখন বাঙালিরা কথাবার্তা বলেন, যে-বাংলা এখন বাঙালির কাজের ভাষা, যার ব্যাকরণ এখনও লেখা হয়নি, যার প্রায় সমস্ত শব্দই ইংরেজি শব্দের মতো বিশেষ্যভিত্তিক শব্দার্থবিধি মেনে চলে, যার হাতে জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজকের অজস্র খ্যাত-অখ্যাত প্রান্তিক লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের বিশাল সাহিত্যসম্ভার রয়েছে এবং যা পুষ্পে-পল্লবে প্রত্যহ আরও বিকশিত হচ্ছে, সেটিই বিশেষ্যভিত্তিক বাংলা। আর, যে-বাংলাভাষায় এখন প্রায় কোনো বাঙালি কথাবার্তা বলেন না, যে-বাংলা এখনকার বাঙালির কাজের ভাষা নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণই যার ব্যাকরণরূপে প্রচলিত রয়েছে, যার বেশির ভাগ শব্দই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মেনে চলে, যার হাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাশী মহাভারত নামে দুইখানি মহাকাব্য রয়েছে, রয়েছে বৈষ্ণবসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের সম্ভার, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের হাতে লালিত পালিত পদাবলী সাহিত্য ও পদমঞ্জুষাদি, আর রয়েছে অনূদিত বেদপুরাণাদির বিশাল সম্ভার, যেগুলির প্রতি একালের 'আধুনিক' বাংলাভাষাচর্চাকারীদের চরম অবহেলার ফলে এবং ঐতিহ্যবাদীদের মিথ্যা বাগাড়ম্বরের কারণে যার অধিকাংশ অর্থই আমরা ভুলে গেছি, সেটিই ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষা।

বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা দুটোকেই এক রাখতে পেরেছিলেন, তার কারণ ছিল 'সময়'। যেহেতু ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষা মানুষের (পণ্যহীন) যৌথসমাজের ভাববিনিময়ের ভাষার উত্তম-উত্তরাধিকার, যতদিন যৌথ-ব্যবস্থার কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন সে-ভাষার আধার থাকছেই–নেচারের এই এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। বিদ্যাসাগরের সময় যৌথসমাজ না-থাকলেও বাঙালির যৌথ-পরিবার-ব্যবস্থা (যে-ব্যবস্থার দিকে ভূপেন দত্ত ও মার্কস সাহেব বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন) তখনও প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল। রবীন্দ্রনাথের কালেই ভাষা দুটি আলাদা হতে চাইছিল, কিন্তু তখনও 'সময়' পুরোপুরি পেকে ওঠেনি। কারণ, তখনও বাঙালির যৌথ-পরিবার-ব্যবস্থা কমবেশি বিদ্যমান ছিল। ১৯৭০–৮০ সালের পর থেকে বাংলার গণ্ডগ্রামেও যৌথ-পরিবারগুলি প্রায় সবই ভেঙে যায়, শহরে ভাঙে '৪০–'৫০ থেকেই। এখন বাঙালিদের যৌথ-পরিবারের সংখ্যা হাত গোনা।

কিন্তু ইতোমধ্যে কালদোষে সকলের অগোচরে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। ইংরেজের বিশেষ্যভিত্তিক ভাষার একান্ত সহচর ছিল খণ্ডতার দর্শন ও সংস্কৃতি। আর, বাঙালির বিশেষ্যভিত্তিক ভাষার সহচর ছিল অখণ্ডতার দর্শন ও সংস্কৃতি। বাংলা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাকে বিশেষ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে গেলে স্বভাবতই অখণ্ডতার দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধ বাধার কথা। বেধেও গিয়েছিল। এখানেও একধরনের রফা করেছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা। তাঁরা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাকে বিশেষ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে শুরু করলেন বটে, কিন্তু সেই বিশেষ্যভিত্তিক ভাষাতেও জয়গান গাইলেন অখণ্ড দর্শন ও অখণ্ড সংস্কৃতির। আর এই কাজে সবচেয়ে সফল হলেন রবীন্দ্রনাথ। জগৎ তাঁকে নোবেল সম্মানে ভূষিত করে দিল। ওদিকে ইংরেজের নিজের দেশের পদার্থবিদ্যা, যে কিনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রকৃতির সঙ্গে সত্য ব্যবহার করে' এগোচ্ছিল (এবং এটাই তার আজীবন স্বভাব) সে গিয়ে হাজির হল তাদের ভাষা ও দর্শনের একেবারে বিপরীত মেরুতে। পদার্থবিজ্ঞানীরা বুঝলেন, বস্তুবিশ্বের বিশ্লেষণে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা ও খণ্ডতার দর্শন আর কাজ চালাতে পারছে না, তার জন্য ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ও অখণ্ডতার দর্শন চাই।১৮ রাখে হরি মারে কে! এ তো মহা মুশকিল! পাশ্চাত্যের (বা একালের 'কেন্দ্র'-র) দর্শন-সংস্কৃতি-ভাষা এসে যখন (একালের 'প্রান্ত') আমাদের দর্শন-সংস্কৃতি-ভাষার কাছে দাবি করছে, তোমাদের ওই থলি, থলির ভিতরের আগুন ফেলে দাও, নইলে আমাদের সঙ্গে তোমরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারবে না, আর তাই শুনে আমাদের বিধায়কেরা আগুনসমেত থলি ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন, তখনই শোনা যাচ্ছে সেই পাশ্চাত্যের (কেন্দ্র'র) নিজের গর্ভগৃহেই আমাদের এই থলি ও তার আগুনের অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গোলোকায়নের এই যুগে কেবল নিম, বাসমতী, আয়ুর্বেদের গাছগাছড়া, কিংবা বাঙালির রান্নাবান্নাই নয়, বাঙালির ভাষা ও দর্শনের ক্ষেত্রেও আমাদের এই অদ্ভুত অবস্থান! হিরা ফেলে কাঁচ, আগুন ফেলে আঁচ! আমরা যাকে ফেলে দিচ্ছি কিংবা ফেলে দেব কি না ভেবে মরছি, সবচেয়ে শক্তিমান দেশের মালটি-বিলিয়োনিয়াররা সেটার জন্যই ভিতরে ভিতরে হা-পিত্যেশ করছে! কী কাণ্ড! আবার তো সেই রবীন্দ্রনাথের সমস্যাই হয়ে গেল—ফেলতে গেলে লাগে, রাখতে গেলে বাজে। এদিকে আমাদের শিক্ষাজগৎ ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাকে অবহেলা-উপেক্ষায় প্রায় শেষ করে এনেছেন, বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাও তার ভাষা-শৃঙ্খলাটি শৃঙ্খলে পরিণত হয়ে যাওয়ায় বিশেষ এগোতে পারেনি। ফলে, একদিকে বিশেষ্যভিত্তিক চলতি বাংলা যেমন এতদিনেও নিজেকে আপডেট করতে পারেনি, নিজের ব্যাকরণ লিখে নিতে পারেনি, অপরদিকে ক্রিয়াভিত্তিক সাধু বাংলাও তার প্রায় সমস্ত মহান উপলব্ধিগুলি গেছে ভুলে। তবে এখনও সময় আছে সেই উপলব্ধিগুলিকে পুনরায় জাগিয়ে নেওয়ার, এমনকি তাকেও আপডেট করে নেওয়ার। এখনও বাঙালিদের মধ্যে বহু পণ্ডিত বেঁচে আছেন, কলকাতায় যত কলকাতার বাইরে তার তুলনায় অনেক বেশিই, যাঁদের হাতে অজস্র তথ্য আছে, রসদ আছে, উত্তরাধিকার আছে, তা তাঁরা উত্তম বা নিম্ন-অধিকারী রূপে বেঁচে থাকুন কিংবা নিতান্ত 'বইবাহিক' রূপেই বেঁচে থাকুন। তার ওপর রয়েছে প্রাচীন বাংলা ছাপা অজস্র বইয়ের সম্ভার, যা বিদ্যাসাগরের সময় তো ছিলই না, রবীন্দ্রনাথের সময়ও তত ছিল না। এখনও সময় আছে—অলৌকিক আনন্দের যে-ভার বিধাতা আমাদের দিয়েছিলেন, বিশ্বমানবের জন্য যে-ঊর্ধ্বশিখা জ্বেলে রাখার কথা ছিল আমাদের, সেটি এখন অবহেলা উপেক্ষায় ভুগে ভুগে অগ্নি থেকে অঙ্গারে পরিণত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও নিভে যায়নি। সে-অঙ্গার থেকে পুনরায়

অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে নেওয়া সম্ভব, তাকে কল্যাণী মহাশক্তিতে নবরূপায়িত করাও সম্ভব। এখনও উপায় আছে।

বিধাতার এই দানই রয়েছে বাংলাভাষা সংস্কারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার মূলে। মানবসভ্যতার আদি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল) ভাষা, সে-ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস, তার স্বভাব, তার উত্তরাধিকার, হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটতে হাঁটতে রোদবৃষ্টি জলকাদা পেরিয়ে আসতে আসতে বিশ্বের অন্য সমস্ত জাতি যা হারিয়ে ফেলেছে, সেটি এখনও রয়েছে বাংলাভাষাভাষীদের হাতে। সেই 'বর্ণার্থমূলক-বহুঅর্থধারী' ভাষা মানুষের পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাক, সম্ভবত প্রকৃতির সেরূপ ইচ্ছা নয়। বলতে কি, গতকাল পর্যন্ত এই 'বর্ণার্থবাদিতা' কিংবা 'বহু-অর্থধারণস্বভাব' যদি বাংলাভাষার ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, দেখা যাবে আগামীকাল সেটিই বাংলাভাষাভাষীদের মহত্তম গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়তো, একটি ভাষার প্রতিটি শব্দের একটি করে মানে ও একরূপ বানান বানিয়ে নেওয়াতে এমন কী অসুবিধা ছিল? যে-কোনো জাতিই পারে। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিই তো সেরকম করেও ফেলেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সেরকম করতে পারতেন না? নিশ্চয় পারতেন। চাইলে, আমরা তো এখনও তা করতে পারি। আমাদের রোখে কে?

রোখে সেই আগুন। হে প্রমথ! সত্য বলো! প্রমিথিউসকে ওরা মেরেছে, আমরা কিন্তু তোমাকে এখনও দোষারোপ পর্যন্ত করিনি। কিন্তু, সত্য বলো! যে-আগুনে আমাদের বাংলাভাষাভাষীদের প্রাণ আজও অহোরাত্র দগ্ধ হয়, সে কি তুমিই আমাদের দাওনি? বাংলা শব্দের পিঠের থলির ভিতরে আগুনটা তবে কে রেখেছিল?

পাঁচ.

কী আছে বিধাতার মনে! কী ছিল বিধাতার মনে, সে তো আমরা দেখতেই পেলাম। এরপর তাঁর মনে কী আছে, তা আমরা জানি না। তবে, কী থাকতে পারে তার একটা পূর্বধারণা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকের মানুষের জ্ঞানের উৎসমুখে তিনি পুনরায় ক্রিয়াভিত্তিক দর্শন ও ভাষার প্রয়োজনের ডাক দিয়েছেন। উৎসমুখের সেই জ্ঞান সমস্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নেমে আসতে এখনও দেরি আছে। যখন নেমে আসবে তখন এই আগুন অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দেখা দেবে সন্দেহ নাই। তখন তা পাব কোথায়, এখন যদি যা আছে, তা সব ফেলে দিই? তাই এ-আগুন সংরক্ষণ করতেই হবে। আবার বর্তমানের চোখে সবচেয়ে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে গ্লানিগ্রস্ত হওয়ারও কোনো মানে হয় না। তাই কাজ চালানোর জন্য 'আধুনিক'ও হওয়া দরকার। তাই দুটি দিককে যথাযথভাবে রক্ষা করাও দরকার। তবে এ-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে শুরুতেই কয়েকটি বিষয়ে রফা করে নিতেই হবে। ভাষা মাত্রেই দু-পায়ে হাঁটে–সিনট্যাক্স ও সেমানটিক্স। সিনট্যাক্স হল শব্দের সঙ্গে শব্দ গেঁথে বাক্যের মালা তৈরি করবার নিয়ম, যাকে আমরা সাধারণভাবে ব্যাকরণ বলে থাকি। আর, সেমানটিক্স হল শব্দের ভিতরে মানে ঢুকিয়ে দেবার ও বের করবার নিয়ম, যাকে আমাদের শাস্ত্রকারগণ সাধারণভাবে নিরুক্ত বলে থাকেন। তথ্য এই যে, বিশেষ্যভিত্তিক ভাষার সিনট্যাক্সের সর্বোচ্চ আবিষ্কার পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা করে ফেলেছেন, কিন্তু সেমানটিক্সের বিষয়ে তাঁরা প্রায় কিছুই জানেন না। কথাটি চমস্কি প্রমুখ পণ্ডিতেরা স্বীকারও করেছেন। কারণ, সেমানটিক্স বিষয়ে মানবসভ্যতার যতটুকু যা অর্জন, তা সবই ছিল প্রাচ্যের হাতে, ভারতীয় উপমহাদেশের শব্দশাস্ত্রকারদের হাতে, এবং অগৌরবের কথা এই যে, তার বেশির ভাগটাই তাঁদের উত্তরসূরিরা, আমরা, ভুলে গিয়েছিলাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত সেই স্মৃতি আমাদের ফিরে আসেনি। বর্তমানে তা উদ্ধার করবার উপায় আবিষ্কার করা গেছে, জানা গেছে রত্নগুহায় প্রবেশ করবার খুল-যা-সিমসিম-মন্ত্র, যৎসামান্য উদ্ধার করে আনাও হয়েছে, তবে উদ্ধারের অধিকাংশ কাজটাই এখনও বাকি।১৯

পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় শব্দের বর্ণেরা (ধ্বনিরা) মানে ধারণ করে না। এটিই বিশ্বের সমস্ত ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলাভাষার মূল ও প্রধান পার্থক্য। ফলে, অন্য যে-কোনো ভাষায় একটি শব্দ থেকে একটি বা দুটি বর্ণ বাদ দিলে, বা নতুন এক-দুটি বর্ণ জুড়ে দিলে শব্দের মানে বদলায় না। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলা ভাষায়, অর্থাৎ তৎসম শব্দের বেলায় সেরকম করলেই মানে বদলে যায়। যেমন ইংরেজরা আগে লিখতেন পড়সবঃয, এখন লেখেন পড়সব, কোনো অসুবিধে হয়নি। অভিবাসিত ২০ মার্কিনরা তো colour-কে color, programme-কে program, এরকম বহু বদল করে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের মৎস্য, আচার্য্য প্রভৃতি শব্দের 'য'-ফলা বাদ দিয়ে দিলে মানে বদলে যাবে। এমতাবস্থায়, 'বাংলা বর্ণ মাত্রেই অর্থ ধারণ করে'–এই কথা যাঁরা জানেন না, তাঁরাই বসেছেন বানানের সমতাবিধান করতে। বাংলা শব্দের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ যে-সেকেলে লোহার সিন্দুকটিতে রেখে দিয়ে শাশুড়ি মহাশয়া তার চাবিটাই হারিয়ে ফেলেছেন, ঘর সাফ-সুতরো (রিনোভেশন) করতে গিয়ে সেই সিন্দুকটাকেই এরা ফেলে দিতে চলেছে! ভাবা যায়!

অন্যদিকে বর্তমানে সারা পৃথিবীর সব ভাষাভাষীই বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় কথা বলে থাকেন। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের ভাষায় একটি শব্দের একটি অর্থ একরূপ বানান করে কাজ চালাচ্ছেন, সেভাবেই কমপিউটারকেও বানিয়ে ফেলা গেছে। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার কথা তাঁদের জানা নেই (আমরা নিজেরাই যখন অনেকটাই ভুলে গেছি, তাঁদের না-জানারই কথা) এই ভাষাকে কমপিউটার-ফ্রেন্ডলি করার বা কমপিউটারকে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার যোগ্য করার কথা ভাবাই হয়নি। এমতাবস্থায় কীভাবে আমরা দুদিক রক্ষা করতে পারি?

এ-বিষয়ে মৌল নীতিটি কেমন হতে পারে, তার কথাই এখন আমি বলব। এই নিবন্ধে তার বেশি আলোচনা করবার অবকাশ কম। আমার মূল কথা এই যে, মানুষের আদি-ভাষা, মানুষ যা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছিল, যার উত্তরাধিকার সবচেয়ে বেশি রয়েছে বাংলাভাষার, সেই উত্তরাধিকারকে সজ্ঞানে রক্ষা করা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলাও দরকার। তাই ব্যবহারিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমার মনে হয়, বাংলাভাষাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করে নিলে ভালো হয়–প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও উচ্চতর বাংলা। প্রাথমিক স্তরের বাংলা হোক সাধারণ বাংলাভাষা, সংবাদপত্রের ভাষা, কাজের ভাষা। এ-বাংলাভাষার পাঠ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত চলতে পারে। সপ্তম শ্রেণী থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের বাংলাভাষার পাঠ চলতে পারে। তদূর্ধ্বে উচ্চতর স্তরের বাংলার পাঠ চলাই মঙ্গলজনক হবে বলে আমার মনে হয়।

প্রাথমিক বাংলাভাষার মূল নীতি হতে হবে বিশেষ্যভিত্তিক। এক্ষেত্রে বানানের সমতাবিধান করে নিতেই হবে। তবে এটি করার সময় কোন বানান বেশির ভাগ লেখাপড়া-জানা বাংলাভাষী মানুষ সাধারণত লিখে থাকেন, সেটি সার্ভের মাধ্যমে জেনে নিয়ে সেইরূপ বানান স্থির করলেই ভালো হয়। বেশির ভাগ মানুষ যদি পাখি, চীন, মন্ত্রী, শিল্পী লেখেন, সেরকম লেখাই ভালো। এতে হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ যেটি সুবিধা, সেটিই লেখা চলতে পারে। প্রাথমিক স্তরের বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতি দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক স্তরের বাংলায় কোনো বানান চাপিয়ে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। আর, বানান মুখস্থ করার প্রশ্ন যদি আসে, তা হলে মনে রাখা ভালো যে, পৃথিবীর সমস্ত লোগোসেন্ট্রিক ভাষায় শব্দের বানান মুখস্থই করতে হয়। আমাদেরটাও না-হয় মুখস্থই করা হবে। তা ছাড়া, এতে কমপিউটারের কোনো অসুবিধা হয় না। আর, তা ছাড়া এমন তো হতেই পারে, আজকাল যেমন ছেলেমেয়েরা ক্যালকুলেটার রয়েছে বলে নামতা মুখস্থ করে না, তেমনি কিছুদিন পরে হয়তো ব্যবহারিক বাংলা লেখাপড়ার জন্য কেউ বানান মুখস্থ করবে না, কমপিউটারেই সব হবে। যাই হোক, এই বানান অনুসারেই প্রাথমিক স্তরের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদির সমস্ত বানান সংস্কার করে নিতে হবে, তা সে বিদ্যাসাগরের গদ্যাংশের হোক আর রবীন্দ্রনাথের গদ্যাংশেরই হোক। তাই বলে কৃত্তিবাসের বা ভারতচন্দ্রের বর্ণার্থমূলক-বহুঅর্থধারী ভাষায় লেখা কোনো রচনার ক্ষেত্রে এরকম করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সে-ধরনের রচনা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রচনার পাঠ শুরু করতে হবে সপ্তম শ্রেণী থেকে একটু একটু করে।

প্রাথমিক স্তরে বাংলা শব্দের অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রেও একটি শব্দের একটি অর্থই দিতে হবে। খুব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কখনওই দুটি অর্থ না-দেওয়াই ভালো। ততোধিকের তো প্রশ্নই আসে না। উদাহরণস্বরূপ–পদ শব্দের অর্থ পা, চাকরিতে গৃহীত আসন, কবিতার চরণ, বাক্যাংশ প্রভৃতি হয়। কিন্তু এগুলির সবগুলি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পা-তো দেওয়াই যাবে না, কারণ তা হলে পদোন্নতি, পদত্যাগ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে টক্কর লেগে যাবে। তাই এক্ষেত্রে বিবেচনা করে যেটি সাধারণত সবাই বলে থাকেন, বা বোঝেন, সেইরকম অর্থ দিতে হবে। যেমন 'চাকরিতে গৃহীত আসন' দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজি 'পোস্ট' কথাটি দেওয়াও চলতে পারে। কারণ, 'কোন পোস্টে চাকরি করেন'-জাতীয় বাক্য এখন প্রায় সব বাঙালিই বোঝেন। কোনো ছুঁৎমার্গ না থাকাই ভালো। প্রাথমিক স্তরে বাংলা লিপির ব্যাপারে খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কারণ, আমার মতে বানান-জ্ঞান, অর্থ-জ্ঞান প্রাথমিক স্তরেই চূড়ান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। কিন্তু লিপিজ্ঞান প্রাথমিক স্তরেই চূড়ান্ত করে ফেলা চাই। মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে লিপির আর কোনো বদল না-হলেই ভালো। তা হলে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ-নেওয়া বাংলাভাষাভাষী মানুষ চাইলে উচ্চতম স্তরের বাংলা বইপত্রও পড়তে পারবেন। তার জন্য তাঁকে আলাদা ট্রেনিং নিতে হবে না। সেই কারণে, প্রাথমিক স্তরে যে-লিপি শেখানো হবে, সেটিই চূড়ান্ত হতে হবে। দোতলা তিনতলা বর্ণের ক্ষেত্রে সমমর্যাদা আনার চেষ্টা করা ভালো। তবে এ-বিষয়ে, যাঁরা লিপি নিয়ে কাজ করেন, টাইপ করেন, যাঁরা যথেষ্ট জানেন, তাঁদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। যেহেতু লেখ-প্রযুক্তি বিষয়টি মূলত প্রযুক্তিগত, এই বিষয়ে লেখ-প্রযুক্তিবিদদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলতে পারে। তবে, মনে রাখা ভালো, যাঁরা কোনো বিষয়ের শাখা থেকে প্রশাখা, প্রশাখা থেকে তস্য প্রশাখায় উঠে আকাশচুম্বী স্থানে অবস্থান করেন, অনেক সময় তাঁদের 'কাণ্ড'জ্ঞান থাকে না। স্পেশালিস্টদের নিয়ে এই এক সমস্যা। তবে তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় কিছু-কিছু 'কাণ্ড'জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও আছেন। মাধ্যমিক স্তরের বাংলার বানান ও অর্থ কেমন হবে? কেমন হবে উচ্চতর স্তরের বাংলা বানানরীতি ও অর্থ দেওয়ার রীতি? আমার মনে হয়, সপ্তম শ্রেণী থেকে বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় শুরু হয়ে যাওয়া দরকার। এই পরিচয় ক্রমশ বাড়তে বাড়তে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বরূপের চূড়ান্ত রূপটিকে যেন চিনে নিতে পারে ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এই স্তরের বাংলাভাষায় বিদ্যাসাগর থেকে একালের সাহিত্যরচয়িতাদের বয়ান অবিকল থাকাই ভালো। ভারী বিষয় বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাভাষায় কেমন করে উপস্থাপন করতে হয়, তার অনুশীলন এই স্তরে শেষ করে ফেলতে হবে। আর, ভারী বিষয় কেমন করে ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষায় উপস্থাপন করতে হয়, তার অনুশীলন এই স্তরে শুরু হতে পারে। তার চূড়ান্ত অনুশীলন চলুক উচ্চতর স্তরের বাংলাভাষায়। বলে রাখা ভালো, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বহুশাখার সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞানচর্চা একসঙ্গে করা যায়। যে-কারণে বেদ-উপনিষদকে জ্ঞানভাণ্ডার বলে মনে হয় আজও। উচ্চতর স্তরের বাংলাভাষার দুটো দিক থাকবেই–অতীতের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-দর্শনের সর্বশেষ উপলব্ধির সম্পর্ক-নির্ণয়। অতীতের জ্ঞানের আবার দুটো দিক থাকছেই–প্রাচীন বাংলার উপলব্ধি ও পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় এখনও যে-ভাষা-জিনগুলি রয়েছে, তাদের অনুসন্ধান করে সম্পর্ক-নির্ণয়। এই স্তরের বাংলাভাষার বানান ও অর্থ দুটোই সংস্কৃত-অনুসারী অর্থাৎ বর্ণার্থমূলক-বহুঅর্থধারী বা ক্রিয়াভিত্তিক হতেই হবে। এই স্তরে একাধারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থ, ইলিয়ড-ওডিসি প্রভৃতি গ্রন্থ, অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির আদিভাষার সঙ্গে

আদি বাংলার সম্পর্ক-বিষয়ক পাঠ থাকলেই ভালো হয়। অবশ্যই এই স্তরের ভাষাশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে একালের বিজ্ঞানের দর্শনসংক্রান্ত পাঠ। এরকম হলেই ঠিক হবে বলে আমার মনে হয়। মোট কথা এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে দুটো দিকই যথার্থভাবে রক্ষিত হয়।

কিন্তু মূল নীতি নির্ধারণ করা যেমন এক কঠিন কাজ, বাস্তবে তা যথাযথভাবে রূপায়ণ করা তার চেয়ে কম কঠিন কাজ নয়। কাণ্ডের জন্য কাণ্ডজ্ঞানটাই (জেনারেলাইজেশন) সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন। কিন্তু শাখায়-শাখায়, প্রশাখায়-প্রশাখায়, পাতায়-পাতায় সেই নীতির বহু সূক্ষ্ম ও খুচরো সমস্যার সমাধান করতে অনেক সূক্ষ্ম স্তরের বিদ্যাবুদ্ধি (স্পেশালাইজেশন) লাগে। তা অর্জন করে কাজে লাগানো দরকার। এর দু-চারটি উদাহরণ দিয়ে এই নিবন্ধ আপাতত শেষ করব।

যতদূর বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রে যে-প্রধান সমস্যার আমরা মুখোমুখি হতে পারি, সেটিকে খুব সহজ করে বললে বলতে হয় প্রজননের সমস্যা। প্রজননের ক্ষমতা নেই, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য শারীরিক অঙ্গকে অক্ষম করে ফেলা হল, তাই সন্তান জন্মাচ্ছে না—এটা একরকম। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে টিকিয়েও রাখতে হবে, নষ্ট করা যাবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রজনন যেন না হয়, ব্যবস্থা করতে হবে তার। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন। প্রথমটি গায়ের জোরে অচেতন নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়টি স্বেচ্ছায় সচেতন নিয়ন্ত্রণ। বহু অর্থধারী শব্দ হাতে থাকা সত্ত্বেও একার্থসম্বল শব্দ ব্যবহার এক কঠিন কাজ। তাই, প্রাথমিক স্তরের বাংলাভাষায় শব্দচয়ন, তাদের একার্থবাচক করে রাখা রীতিমতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তবু সে-কাজ করতে হবে। করা যাবেও। তবে করা গেলেও কাজটি কত কঠিন, নীচের উদাহরণগুলি থেকে সেকথা টের পাওয়া যাবে।

'পত্র' শব্দটির কথাই ধরা যাক। এর দুরকম বানান হয়। প ত-য়ে র-ফলা 'পত্র', এবং প ত-য় ত-য়ে র-ফলা 'পত্ত্র'। এই দ্বিতীয় 'পত্ত্র' কমপিউটার সফটঅয়ারের হরফ-নির্মাতারা উড়িয়ে দিয়েছেন, তাই যথার্থভাবে এখন লেখাও যাচ্ছে না। কারণ একালের বিশেষ্যভিত্তিক বাংলায় সবক্ষেত্রেই 'পত্র' লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা অনুসারে শব্দ দুটির অর্থ একেবারেই আলাদা। 'পতন রহে যাহাতে' সেটিই 'পত্র' বা পাতা। এই পত্র স্বভাবতই যা-কিছু 'পড়ে যায়', 'পড়ে যাওয়া যায়', তাদের সবাইকেই বোঝায়। মনে রাখা ভালো, নিম্নমানের গ্রন্থ পাঠ করলে মানুষের 'অবগতি' বা নিম্নগতি হয়।

তাই গাছের পাতার মতো কিছু-কিছু পাঠযোগ্য (গ্রন্থের, পত্রিকার, হ্যান্ডবিলের) পাতাও 'পত্র'। কিন্তু 'পতন থেকে ত্রাণ রহে যাহাতে' তাকে বলে 'পত্ত্র'। সাধারণত দলিল, চুক্তিপত্র, রাজনির্দেশ, নিয়োগপত্র, সার্টিফিকেট, চেক, কারেন্সি নোট, থিসিস, উচ্চচিন্তার যে-কোনো গ্রন্থের পাতায় 'পতন থেকে ত্রাণ' থাকে। এরা পড়ে না, পড়তে দেয় না, উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতএব 'পত্র' কথাটি প্রাথমিক বাংলায় থাকতে পারে 'পাতা' অর্থে, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের বাংলায় 'পত্র' ও 'পত্ত্র', 'পত্র-পত্রিকা' ও 'পত্ত্র-পত্ত্রিকা' দুরকমই থাকতে হবে। নইলে 'পতন থেকে ত্রাণ'-এর কনসেপ্টটাই আমরা হারিয়ে ফেলব।

সুনীলবাবু 'য'-ফলার সমস্যার কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রেও সমস্যাটি বেশ সূক্ষ্ম। আচার্য শব্দটির কথাই ধরা যাক। এখনকার আচার্যেরা 'আচার্য্য' শব্দের 'য'-ফলা বাদ দিয়ে 'আচার্য' হয়ে বসে আছেন। এর ফলে কী হয়েছে, ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষার শরণাপন্ন হলেই আমরা তা জানতে পারব। একালের আধুনিক বাঙালিরা জানেন, আচার্য মানে teacher। শব্দটির বানান আচার্যই রাখি, আর আচার্য্যই রাখি, আধুনিক বাংলাভাষায় লোকে বোঝে শব্দটির নির্দেশকতা teacher। কিন্তু প্রাচীন (ক্রিয়াভিত্তিক) বাংলাভাষায় সেরকম রীতি নেই। সে-রীতি অনুসারে শব্দটির ও তার অর্থটির বানান ও অর্থের বিস্তার ঘটেছে এভাবে–

শব্দ	সুতো	ফলক	লোগো
চ্ =	চয়ন/ চলন		
র্ =	রহন/ রক্ষণ/ ভক্ষণ		
চর =	চয়ন/ চলন রহে যাহাতে।	= গুপ্তচর, সহচর, অনুচরাদি।	=গুপ্তচর
চরণ =	যার সাহায্যে চরে।	= মানুষের পা, কবিতার পা, ইত্যাদি।	=পা
আচরণ =	চরণের আধার হয় যে। চরণে চরণে (পদে পদে) যা (যে ব্যবহার, বক্তব্য, সুর ইত্যাদি) ধরা থাকে।	= রীতিনীতি, প্রথানুগ ব্যবহারাদি।	= ব্যবহার
চর =	চয়ন/ চলন রহে যাহাতে।		
চার =	চর হইতে জাত		= -ture
আচার =	চার-এর আশ্রয় বা আচরণসমূহের আশ্রয় যাহাতে।		
আচার্য =	আচার (ধরা) থাকে যাহাতে (কাগজ, বই, নির্দেশাদির আধার, যাতে আচার লেখা থাকে)।		
আচার্য্য =	আচার্য (ধরা) থাকে যাহাতে (সেই বই, নির্দেশাদি যিনি মুখস্থ রাখেন)।		

মূল শব্দ 'চর'। তার গলার মালার সূত্রটি (সুতোটি) হল 'চয়ন/চলন রহে যাহাতে'। সেই সুতোয় যে ফলকগুলি লটকে রাখা হয়েছে, সেগুলি হল গুপ্তচর, সহচর, অনুচর, উপরিচর, খেচর, ইত্যাদি নানারকম চর। এই ফলকগুলির ভিতরে কেবলমাত্র গুপ্তচর অর্থে চর শব্দের লোগোতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা শব্দটিকে প্রায় অর্থহীনভাবে ধরে রেখেছে adventure, future, culture প্রভৃতি শব্দের 'ture' অংশে। তাদের উত্তরাধিকার এটুকুই। যাই হোক, এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা সম্ভব যে, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার শব্দের প্রতিটি বর্ণই অর্থধারণকারী। তাই সে সমস্ত শব্দের একটি বর্ণকে বাদ দিলে, বর্ণটি যে-অর্থকে ধারণ করে রেখেছিল, সেটি বাদ পড়ে যাবে। এইজন্য ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার শব্দের বানান বদলানো যাবে না। এক্ষেত্রে সংস্কৃত বানান অনুসরণই আদর্শ। অন্যদিকে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় শব্দের বানান বদল করলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আচার্য লিখলেও যা, আচার্য্য লিখলেও তা-ই। অতএব আমরা একালের সুবিধামতো বানান লিখতে পারি, তবে সে-বানান সর্বমান্য, সর্বসম্মত হলেই ভালো। তা হলে এখন সিদ্ধান্ত করা চলতে পারে যে, প্রাথমিক স্তরের বাংলায় থাকবে অধ্যাপক অর্থে 'আচার্য', কিন্তু তদূর্ধ্ব স্তরের বাংলায় 'আচার্য' ও 'আচার্য্য' দুটি শব্দকেই রাখতে হবে।

ছয়.

এখন তা হলে কী করি!

'প্রাচীন বাংলাভাষার শব্দের বর্ণ বা ধ্বনিগুলিই অর্থ ধারণ করে'–একালের একজন কমপিউটার বিজ্ঞানী (প্রোগ্রামার) একথা শুনে বলে বসতে পারেন–আরে! এ তো খুবই উন্নতমানের 'প্রযুক্তি'! শব্দের বা আওয়াজের মানে জানার জন্য sound-এর বাইরে যেতে হচ্ছে না! এ-প্রযুক্তিকে কমপিউটারে ব্যবহার করে ফেলতে পারলে তো ভাষার দুনিয়ায় এক মহাবিপ্লব ঘটে যাবে! কেবল অজানা ভাষায় কথা-বলা মানুষের ভাষাই নয়, জীবজন্তুর ভাষাও তো অনুবাদ করে দেবে কমপিউটার! আর, নিউরন-কমপিউটার (যা প্রস্তুতির পথে) তো বলতে গেলে সেজন্যই অপেক্ষা করছে! শব্দের দুনিয়ায় তা হলে তো এক মহাবিপ্লব ঘটে যাবে!

তা হয়তো যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে সে-উপায় নেই। কারণ প্রযুক্তিটিতে মরচে পড়ে একেবারে ঢেকে গেছে। বহুকালের অব্যবহারের মরচে, অপব্যবহারের মরচে, বেশ কিছু কৌশলের উপর বিস্মৃতির মরচে এবং ঘোর ঐতিহ্যবাদীদের চরম অবহেলার কারণে সার্বিক ময়লায় ভরে রয়েছে সেই প্রযুক্তি। একে সাফ করে কাজের উপযোগী করতে বেশ কিছু মানুষকে বেশ কিছুদিন খাটাখাটনি করতে হবে। একজনের পক্ষে সারা জীবনেও সেই মরচে সাফ করা প্রায় অসম্ভব!

এক শব্দের এক অর্থ থাকা ভাষার লোকাল-স্বভাব, আর এক শব্দের বহু অর্থ থাকা ভাষার গ্লোবাল-স্বভাব। আজকের দুনিয়ার প্রায় সব ভাষাই লোকাল-স্বভাবের, আমাদের বাংলাভাষার লোকাল-স্বভাব ও গ্লোবাল-স্বভাব দুটোই রয়েছে। (সংস্কৃতেরও রয়েছে, কিন্তু সে তো মৃত ভাষা, লোকে সংস্কৃতে কথা বলে না।) দুটোকে এতকাল একত্রে মিলিয়ে রাখা হয়েছিল খানিকটা অচেতনভাবে। এখন সচেতনভাবে দুটোরই পরিচর্যা করা দরকার। প্রাথমিক স্তরের বাংলায় আমরা লোকালের সাধনা করব, লোকালাইজেশনের সাধনা করব, উচ্চতর স্তরের বাংলায় আমরা গ্লোবালের সাধনা করব, গ্লোবালাইজেশনের সাধনা করব। মাধ্যমিক স্তরের বাংলায় থাকবে প্রথম থেকে তৃতীয়ে উত্তরণের সাধনা। গোলোকায়নের এই যুগে এটাই আমাদের শুভ ফল এনে দেবে বলে মনে হয়।

টীকা ও টুকিটাকি

১. সমাজে নতুন প্রযুক্তির আগমন 'মর্মান্তিক-সুখ'কর। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেই 'মর্মান্তিক-সুখ'কে প্রকাশ করেছেন এভাবে–'নবাবগঞ্জে কল বসেছে নতুন ধানের কল/চাষির ধান যাবে সেথায় ঢেঁকির চোখে জল।' নতুন প্রযুক্তির সামনে ঢেঁকি যেমন বাঁচেনি, বাঁচেনি তার গান, গায়িকারা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ, তেমনি বাংলা ভাষার 'প্রুফ-রিডার'ও বাঁচবে না। ঢেঁকির মতোই লেটার প্রেস মরেছে, মরবে তার সাঙ্গপাঙ্গ, প্রুফ-রিডারও, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী, আজ নয়তো কাল।

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৭ সালের ২০ মে প্রকাশিত তাঁদের 'বাংলা বানানের নিয়ম' গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে এরকম ১৩টি নির্দেশিকা রাখেন। আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি ২০০৩-এ প্রকাশিত তাঁদের সর্বশেষ বানানবিধিতে এরকম ২০টি নির্দেশ দেন। সাহিত্য সংসদ তাঁদের বানানবিধিতে এরকম ৩১টি (খুচরো) বানানবিধি অনুসরণ করবার পরামর্শ দিয়েছেন। এরকম আরও আছে। সবক্ষেত্রে একটি শব্দের একাধিক বানানের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বাংলা শব্দের ভিতর থেকে তার সংস্কৃত উত্তরাধিকারকে গুরুত্ব না- দেওয়ার। আর যত দিন গেছে, ততই বেশি বেশি করে হাত পড়েছে উত্তরাধিকারে।

৩. ‘বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।’ ভাষার ইঙ্গিত, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড।– এবং –‘...যে-সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে-সকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনওই মরিবার নহে।’ ভাষাবিচ্ছেদ, শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

৪. এর সঙ্গে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া দেখা দিয়েছে। সমতাবিধায়করা তো ঠিক-বেঠিকের কোনো বিজ্ঞানসম্মত বা সর্বজনসম্মত নীতির জোরে কাজ চালান না, এমনকি আধুনিক ‘সার্ভে’ প্রথাও অনুসরণ করেন না–অর্থাৎ, বেশির ভাগ শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণ কী চান, সার্ভের মাধ্যমে তা জেনে নিয়ে তদনুসারেও চলেন না; তাঁরা কাজ চালান তাঁদের লেজ আর শিংয়ের জোরে (নামের শেষে বিএ, এমএ-র যে-লেজ থাকে এবং নামের আগে ‘ড.’ লেখা যে-শিং থাকে, তার জোরে)। সম্প্রতি সেই সমতাবিধায়কদের বড়োজনেরই, পবিত্র সরকার মশাইয়ের, মাথার শিংটি ‘ফলস্ শিং’ বলে রটে গেছে। সেই শিং দিয়ে আর তো গুঁতোনো যাবে না। এ হয়েছে আর এক মুশকিল!

৫. কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে এক ফিচার-লেখক দেখিয়েছিলেন, বাঙালির ঘরকুনো স্বভাবটাই আজকের ইন্টারনেটের যুগে বাঙালির পক্ষে একটি প্লাস পয়েন্ট রূপে দেখা দিয়েছে। আধুনিক যুগের সূত্রপাতে, যে-ভাষার শব্দের বর্ণেরা মানে ধারণ করত তাকে অপাঙ্‌ক্তেয় রায় দেওয়া হত, হয়ও। আজ সেটিই বাংলাভাষার প্লাস পয়েন্ট হতে চলেছে। একেই বলে–‘সময় বড়া বল্‌বান’!

৬. শব্দের প্রতি তাঁদের এই উপেক্ষা এত গভীর যে, তাঁরা কোনো তৎসম শব্দকেই কখনও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন, এমন নিদর্শন পাইনি। বিশ্বাস না হলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন–বেশি দূরে যেতে হবে না, তাঁদের নামের শব্দগুলি তো সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ, সেগুলির রহস্য কি তাঁরা জানেন? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কি নীর-ইন্দ্র-নাথ-চক্র-বর্ত্তী শব্দগুলির অর্থ জানেন? নীরদ তো মেঘ, মেঘ তো মিহ্ ধাতু জাত, মিহ্-র একটা মানে তো মূত্রপুরীষকরণ, তা হলে নীরদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়াল? এটাই সারতে পারেন কি না দেখুন। রইল বাকি ইন্দ্র-নাথ ইত্যাদি। কিংবা পবিত্রবাবুকে ধরুন। পূত যতি পবিত্র হয়, পূতি হয়ে গেলেই তা অপবিত্র হয়ে যায় কেন? একটিমাত্র হ্রস্ব-ই কি তাঁর বর্তমান জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে দেয়নি? কেন? কিংবা জ্যোতিভূষণবাবুকে শুধোন, জ্যোতিষ একই সঙ্গে astrology ও astronomy হয় কোন নিয়মে?

৭. অবশ্য, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের সংখ্যাই ৯৪ শতাংশ। তবে একথা যখন তিনি বলেন, তখনও বাংলা শব্দভাণ্ডারে অসংস্কৃত বাংলা শব্দের সংগ্রহ যথেষ্ট অল্প ছিল। এখন লৌকিক বাংলা শব্দের সংগ্রহ বেড়েছে। তবে যতই বাড়ুক, নিশ্চয় বাংলাভাষায় এখনও সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের পরিমাণ ৬০/৭০ শতাংশের বেশি হবে বলেই অনুমান করি। তাই বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিতে চাইলে বাংলাভাষা তো সর্বহারা ভিখারি হয়ে যাবে।

৮. গঙ্গা-উপাধ্যায় শব্দটির অর্থ advisor of commodity flow বা আদি business executive, ইংরেজি ভাষার বাঙালি লেখক অমিতাভ ঘোষ যে-আদি-NRI-দেরকে আবিষ্কার করেছেন ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের geniza বা গঞ্জগুলিতে অর্থাৎ সেকালের মার্কেটগুলিতে। আজকের গঙ্গোপাধ্যায়গণ এঁদেরই মূল ভূখণ্ডের ভাইবেরাদরদের উত্তরসূরি। ভারতে যে দু-দল ব্রাহ্মণ (আদিম সমাজতন্ত্রবাদী বা বেদবাদী ও আদিম ধনতন্ত্রবাদী বা উপনিষদবাদী) ছিলেন, এঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয় দলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই দ্বিতীয় দলের। বিস্তারিত বিবরণের জন্য শ্রীরবি চক্রবর্তীর লেখা 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' নিবন্ধটি দেখতে পারেন, যা প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা-র ৭১ সংখ্যায়। এই লেখকের ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা নিবন্ধটিতেও বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখকের অন্য গ্রন্থগুলিতেও এ-বিষয়ের কিছু-কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

৯. কিন্তু তার সব কথা এখানেই ব্যাখ্যা করতে গেলে এই নিবন্ধের অবয়ব অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বেড়ে যাবে। সুতরাং এ-বিষয়ে এখানে নয়। আগ্রহী পাঠক লেখকের গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন।

১০. শ্রীকান্ত উপন্যাসের এক স্থানে শরৎচন্দ্র জানাচ্ছেন–ডোমপাড়ার মধু ডোমের কন্যার বিয়ে। কনেপক্ষের পুরোহিত রাখাল পণ্ডিত (ডোম)। তিনি বললেন, পাত্রকে বলতে হবে–'মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ'। পাত্রপক্ষের পুরোহিত শিবু পণ্ডিত (ডোম) বললেন–তা হবে না। পাত্র বলবেন, 'মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ'। শুরু হয়ে গেল বিয়ের যথার্থ মন্ত্র কী, তাই নিয়ে দুই পণ্ডিতের বাদ-প্রতিবাদ। ক্রমে কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষ যে-যার পুরোহিতের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। ফলত অচিরে সেই বাদ-প্রতিবাদ প্রথমে ঝগড়ায়, এবং পরে ক্রমান্বয়ে ঝগড়া-চেঁচামেচি পেরিয়ে মারামারিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।...সম্প্রতি বাংলাভাষার বানান নিয়ে আমাদের প্রিয় বঙ্গভূমে যা চলছে, তা দেখে এই দুই ডোম-পণ্ডিতের কাজিয়ার কথা মনে আসতেই পারে।

১১. দ্রষ্টব্য যাস্ক। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে এ-বিষয়ে অজস্র তথ্য রয়েছে। এই লেখকের পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতিকালের পদার্থবিজ্ঞানীরাও বুঝেছেন, কথাটি ঠিক। 'Whenever one thinks of anything, it seems to be apprehended either as static, or as a series of static images. Yet, in the actual experience of movement, one senses an unbroken, undivided process of flow... actuality of a speeding car.' Wholeness and the Implicate Order. David Bohm.

১২. 'এখানে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল ওদের (ভারতীয়দের) ভাষা। ...যদি সংস্কৃত শিখতে চান.. (দেখবেন) ...একই শব্দ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়, যা সঠিকভাবে বুঝতে হলে, বর্ণনামূলক আখ্যার সাহায্যে একে অন্যের থেকে পার্থক্য বুঝতে হয়। ঠিক কী প্রসঙ্গে কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে না জানলে অথবা বাক্যের শুরু এবং শেষের সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্থির না করলে, শব্দের সঠিক অর্থ বোঝা শক্ত। এই বিত্তে হিন্দুরা (ভারতীয়রা) গৌরবান্বিত কিন্তু বাস্তবিকভাবে এটা ভাষার ত্রুটি।' পৃষ্ঠা ১, আল-বিরুণী রচিত 'ভারত', অনুবাদ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

১৩. আদি ভাষাতে 'গো' শব্দের অর্থ ছিল 'যে যায়', 'Who(ever) go(es)'। কে কে যায়? বঙ্গীয় শব্দকোষ গরু, পৃথিবী, দিক, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নামের মোট ৪৩ জনের উল্লেখ করেছেন। তারা প্রত্যেকেই 'গো'-পদবাচ্য। সেই আদি 'গো' থেকে ইংরেজ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে কেবল যাওয়াটা (go) বা মালার সুতোটা। আর, আমরা বাঙালিরা পেয়েছিলাম মালার সুতোসহ ৪৩টা ফলক বা নামও। আমাদের গো-শব্দের গলায় ওই ৪৩টি অর্থই 'যে যায়' মালায় গেঁথে ঝুলিয়ে রাখা ছিল। কালে কালে আমরা যুগের প্রয়োজনে সেই মালা থেকে কেবল 'গরু'কেই তুলে দেখাতাম। বিদ্যাসাগর এসে বাঙালির সেই অভ্যাস দেখে একটি থলির ভিতরে মালাসহ ৪৩টি অর্থকেই রেখে দিয়ে, থলির উপরে 'গরু' লিখে সেঁটে দিলেন এবং সেইরকম করলেন প্রয়োগের মাধ্যমেই। ফলে, ' গো' মানে 'গরু' একটি প্রথায় পরিণত হয়ে গেল। বাংলাভাষার ঘর বাহির দুদিক রক্ষাও করা গেল।

১৪. 'মহল বিভাগ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেকালের জ্ঞানজগৎ ও কর্মজগতের ভিতরকার বিভাজন বোঝাতে। দ্র. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কালান্তর।

১৫. এই লেখক রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস' কথাটিকে বিশ্বাস করে গ্রন্থগুলি পড়তে গিয়ে টের পান প্রচলিত অভিধানগুলি অনুসরণ করে এই গ্রন্থগুলির অর্থ বোঝা যায় না। পণ্ডিতদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের চেষ্টায় প্রাচীন বাংলাভাষায় ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সন্ধান পান (১৯৮৬ সালে) এবং অবাক বিস্ময়ে দেখেন, তার সাহায্যে ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করে মানে বোঝা যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস, মানবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা, যে-ইতিহাস আধুনিক পৃথিবীর অজানা। ১৯৯৫ সাল থেকে লেখকের অগত্যা লেখনীধারণ। এ-পর্যন্ত লেখকের ৫টি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে এখন পর্যন্ত ঐ ইতিহাসকথার যতখানি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ও ডেভিড বোহ্‌ম প্রাচীন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার কতটা কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'উপসর্গ'-বিষয়ক আলোচনা, ও ডেভিড বোহ্‌মের নিম্নলিখিত (টীকা নং ১৭) গ্রন্থে prefix-সংক্রান্ত আলোচনা থেকে।

১৭. স্মর্তব্য–বাংলাভাষার উদ্ভবকালে (১২০০ খ্রি.) চর্যাপদীয় আদিবাংলা ছিল নিতান্তই প্রান্তিক। ব্রাহ্মণ্যবাদ তাকে মাথা তুলতেই দেয়নি। বঙ্গদেশে পাঠান-রাজত্বের সূত্রপাতের (আনুমানিক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের) পরই কেবল বাংলাভাষা সিংহাসনের ছায়া পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে (আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর) মোগল আমলে মোল্লা ও পুরোহিতের গাঁটছড়ার কারণে পুনরায় তা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশযুগে ইংরাজশাসনের ছত্রছায়ায় (১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে) বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের হাতে বাংলাভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সম্ভব হয়। ওই দুই (পাঠান ও ব্রিটিশ) যুগে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ খর্ব না হলে, বাংলাভাষার বিকাশ হত কি না সন্দেহ। মনে রাখা ভালো, সংস্কৃতভাষা আদি ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মের) হাতে জাত হলেও কালে কালে তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদই (ব্রহ্মরাক্ষসই) ধ্বংস করেছে। অন্যদিকে সংস্কৃতভাষার মূল গুণাগুণকে ধারণ ও পুনঃসৃজন করে ধরে রেখেছে কেবল বাংলাভাষাই।

১৮. ব্রিটিশ বিজ্ঞানী David Bohm সাহেব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন ১৯৮০ সালে–Wholeness and the Implicate Order। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি চ্যাপটারের নাম Fragmentation and wholeness এবং The rheomode–an experiment with language and thought. এর শুরুতেই লেখক জানাচ্ছেন, '… science itself is demanding a new, non-fragmentary world view, in the sense that the present approach of analysis of the world into independently existent parts does not work very well in modern physics.' (page No. xi)। বিজ্ঞানীরা গ্রন্থটিকে গুরুত্ব দেননি সম্ভবত ভাষা ও দর্শনের ব্যাপার বলে, আর ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা একে গুরুত্ব দেননি পদার্থবিজ্ঞানী লিখেছেন বলে। ভাবখানা এই–পদার্থবিজ্ঞানী ভাষার বা দর্শনের বিষয়ে কীই-বা জানবেন! অথচ ভাষা ও দর্শনের প্রকৃত সমস্যা ডেভিড বোহ্‌ম যথার্থই বুঝেছিলেন। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ও অখণ্ড দর্শনের নবরূপে ফিরে আসার আগমনী গানটি তিনিই প্রথম গেয়ে গেছেন। ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার কথা এতাবৎ আর কারও রচনায় পাওয়া যায়নি।

১৯. তন্ত্রশাস্ত্রে এরকম অদ্ভুত কথাও দেখতে পাওয়া যায়। 'শিব-বাক্যে আজ্ঞা আছে… যখন প্রবল 'কলি' প্রবৃত্ত হইবে, তখন অচিরাৎ সে সকল রহস্য জগতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' আর বিশ্বায়ন তো মেসিন-যুগের বা কলিযুগের চূড়ান্তই! হয়তো সেকারণেই অনেকের মস্তিষ্কেই প্রাচীন স্মৃতি নবরূপে দেখা দিচ্ছে। হতে পারে এই লেখকও নিমিত্ত মাত্র। এ-বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার স্থান এই নিবন্ধ নয়।

২০. ইংরেজরা যা পারেনি মার্কিনরা তা পারল এইজন্য যে, অভিবাসিত হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার থেকে তারা আরও এক ধাপ দূরে যেতে পেরেছে। আর, যত দূরে যাবে উত্তরাধিকার ততই খোয়াবে। ততই বর্ণত্যাগ করবার দায় যাবে কমে।

ম ঈ ন চৌ ধু রী

বাংলা বানান সংস্কার : আগুন ও আঁচ!

বাংলা বানান সংস্কার নিয়ে লেখা কলিম খান-এর একটি বড় প্রবন্ধ পড়লাম ত্রৈমাসিক আবহমান-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়। কলিম খান আমার প্রিয় প্রবন্ধকারদের মাঝে একজন এবং তার যে-কোনো-বক্তব্যকে আমি শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করি। কলিম খানের প্রবন্ধের ভাষা আমাকে মোহমুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। আর তাই কলিম খান-এর সব লেখাই আমি বারবার পড়ি, তাঁর বক্তব্যের ভালোমন্দ দিকগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করি নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্যই।

বাংলা বানান নিয়ে যেহেতু আমার শৈশব থেকে একধরনের বিভ্রান্তিতে ভুগছি, তাই কলিমের লেখা 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ!?' বেশ কয়েকবার পড়তে হল আমাকে। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে হল, এটি মূলত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্যের সমালোচনা, আর প্রবন্ধটিতে এমন কিছু বক্তব্যের উপস্থিতি আছে যা সমকালীন ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না। সমকালীন চিন্তা-চেতনার প্রেক্ষিতে কলিমের লেখাটি বিবেচনা করতে গিয়ে তাই আমার মনে কিছু 'ভিন্নমতের' সৃষ্টি হয়েছে, যা লিখতে ইচ্ছে হল কলিমের সাথে 'কাজিয়া' বাধানোর জন্য নয়, শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আমার নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্যই। কলিম খান তাঁর প্রবন্ধটি বিভিন্ন উপ-শিরোনামে বিভক্ত করে লিখেছেন। আমিও তাই আমার ভিন্নমতগুলো কলিম-লিখিত উপ-শিরোনাম ব্যবহার করেই উপস্থাপন করছি।

আটকাচ্ছে কোথায়?

বাংলা বানান সংস্কারের মতো একটি অতিপ্রয়োজনীয় কাজ কেন আমরা করতে পারছি না, তা ভেবে দেখার মতো বিষয় বটে। তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটি মূলত Paradigm বা চেতনা-কাঠামো-সংক্রান্ত। আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ, ধ্বনিবিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিকদের চিন্তা-চেতনা অবস্থান করছে ভিন্ন ভিন্ন Paradigm-এ এবং এর ফলে তাঁরা কিছুতেই একমত হতে পারছেন না বাংলা ব্যাকরণ ও বানান সংস্কার-এর মতো একটি সহজ-জটিল বিষয় নিয়ে। ভাষা যেহেতু আলিবাবার গুপ্তধনের বদ্ধ গুহার মতো না, তাই কেউ খুঁজে পাচ্ছে না 'সিসিম ফাঁক'-এর মতো একটি একক মন্ত্র। আর যেহেতু আমরা কোনো 'একক মন্ত্র' খুঁজে পাচ্ছি না, সেহেতু বর্তমান দেশকাল-গ্রাহ্য বিষয়-আশয় বাদ দিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি রামায়ণ, মহাভারত, মক্কা, মদিনায় আর আমাদের Paradigm-এ ঘুরছে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, বাদরায়ণ, মণ্ডন মিশ্র, নাগেশ ভট্ট, ফ্রেগে, সস্যুর, চমস্কি, লেভি-স্ট্রাউস, কমপিউটার, স্পেল চেক ইত্যাদি ইত্যাদির মতো বিষয়। ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা 'পাকাশয়ের কর্কটজনিত ভীষণ প্রকৃতির দূষিত অর্ব্বুদ (পেটের ক্যান্সার)' সারাতে গিয়ে রোগীর 'ভ্রূণাবস্থা' বিচার-বিশ্লেষণ করে মাতার 'আর্ত্তব-ব্যাধি (অনিয়মিত ঋতু)'র চিকিৎসা করছি।

এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের ভাষা বাংলার প্রাচীন রূপ সপ্তম শতকে খুঁজে পাওয়া গেলেও বাংলাভাষার বিবর্তন সবচেয়ে বেশি ঘটেছে গত একশত বা দেড়শত বছরে। আমাদের ভাষা এখনো প্রচণ্ডভাবে গতিশীল, প্রতিদিনই আমাদের ভাষায় নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে দেশ ও কালের প্রয়োজন মেনে, আমাদের মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে। আমরা প্রতিদিন যেভাবে কথা বলি কিংবা যেভাবে শব্দ উচ্চারণ করে মনের ভাব প্রকাশ করি, সেটাই নির্ধারণ করছে আমাদের ভাষার দেশ-কালকেন্দ্রিক রূপ ও স্বরূপ। কমপিউটার, সফটওয়্যার, ডিজিটাল ক্যামেরা, টিভি, ভিসিডি, ডিভিডি, সিএনজি, ক্লোন, সাইবার, চ্যাট ইত্যাদির মতো বহু শব্দই বাংলাভাষার সম্পদ হয়ে ভাষার শব্দভাণ্ডারে ঢুকে যাচ্ছে। এই নতুন শব্দগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করে নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করাও যুক্তিসঙ্গত নয় বলে মনে হয়, তবে বানান কীভাবে লিখতে হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

কলিম খান তাঁর প্রবন্ধের শুরুতেই বাংলা বানানবিভ্রাটের সাথে কমপিউটার প্রযুক্তিকে টেনে এনেছেন। বর্তমানে কমপিউটার প্রযুক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বাংলা বানানের সবধরনের 'অসমতা' বা variable মেনে নিয়েও একটা কমপিউটার-ফ্রেন্ডলি, বাংলাভাষা-ফ্রেন্ডলি 'স্পেল-চেক' বা 'বানান-সংশোধক' সফটওয়্যার তৈরি করতে পারে। এমন অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে 'হৈ চৈ' এর জায়গায় 'হৈ রৈ' টাইপ করে কিংবা 'করল'-এর পরিবর্তে লিখে 'করহ' তবে কমপিউটার নিম্নোক্ত ছকে বানান সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারে :

অভিধানে নেই	যা আছে তাই থাক
হৈ রৈ	অভিধানে যুক্ত হোক

সঠিক শব্দ নির্বাচন	
হৈ চৈ	
হই-চই	একবার পরিবর্তন করা হোক
হইচই	
হই চই	
হৈ-চৈ	সব পরিবর্তন করা হোক

অভিধানে নেই	যা আছে তাই থাক
করহ	অভিধানে যুক্ত হোক

সঠিক শব্দ নির্বাচন	
কোরলো	
করলো	একবার পরিবর্তন করা হোক
কোরল	
করিল	সব পরিবর্তন করা হোক

কলিম লিখেছেন–"কমপিউটার-প্রযুক্তি কিন্তু তাঁদের এসব অক্ষমতার কথা শুনতে নারাজ। স্পেল-চেকের প্রয়োগ করে ইংল্যান্ড আমেরিকায় সে 'প্রুফ-রিডার'-নামক পেশাদারদের বিলুপ্ত করে দিয়েছে।" কলিমের এ-বক্তব্য মোটেও সঠিক নয়, কারণ কমপিউটার আপাতত এখনও একটি Stupid Machine হিসেবেই বিবেচিত। তাকে মানুষ যা শেখায় তা-ই সে করতে পারে, শব্দের পরম্পরা নিয়ে সে চিন্তা করতে পারে না। কেউ যদি But শব্দের জায়গায় লেখে Put, Compose-এর জায়গায় টাইপ করে Compost কিংবা Root-এর স্থলে লেখে

Room, তবে Computer এ-ভুল ধরতে পারে না (Compose/Compost, But/Put কিংবা Root/Room কমপিউটার-এর কাছে শুদ্ধ বানান হিসেবে বিবেচিত)। ইংরেজি ভাষায় এমন কাছাকাছি বানানের অনেক শব্দ থাকার কারণে কমপিউটারও ভুল করে এবং এ-ভুল সঠিক করতে লেখক নিজে কিংবা পেশাদার প্রুফ-রিডার দিয়ে ফাইনাল প্রুফটি দেখিয়ে নেন। তবে এটি অবশ্যই সত্য যে কমপিউটার প্রযুক্তির কারণে পেশাদার প্রুফ-রিডারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বাংলা বানানের সমতাবিধান যদি আমরা কখনো করতে পারি, তখনও দেখা যাবে 'প্রুফ-রিড' আমাদের করতেই হচ্ছে। যদি তা না করা হয় তবে 'করল' বানান 'করলা' (উচ্ছে-জাতীয় তিক্ত ফল/তরকারি) হয়ে ছাপা হবে এবং যে-কোনো লেখাকেই তিক্ত করে ফেলতে পারে।

বাংলাভাষার বানানে যে সমস্যা রয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে এবং এই বানান কমপিউটার-ফ্রেন্ডলি হোক বা না-হোক, বাংলা বানানের সমতাবিধান করা নিতান্তই প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে কলিম খান-এর সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই।

দুই.

বাংলা বানানের সমতাবিধান করতে গেলে আটকাচ্ছে কোথায়?

বাংলা বানানের সমতাবিধানের চেষ্টা চলে আসছে সেই রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে, যার বিস্তারিত বিবরণ কলিমের প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সমতাবিধান কেন করা যাবে না তা বলতে গিয়ে কলিম আবারও এনেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ–'আমাদের হ্রস্‌সি দীর্ঘি জ্ঞান।' সুনীলসহ আরও অনেক পণ্ডিতব্যক্তি বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার ভূত তাড়াতে বলেছেন। বাংলাভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক কী তা একটু পরে আলোচনা করছি, কিন্তু কলিম-কথিত বাংলাদেশের উর্দু-আরবি আতরসিঞ্চিত নেক বাংলাভাষা নিয়ে এ-পর্যায়ে কিছু বলতে চাই।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর প্রভাবে ও আতরসিঞ্চনে বাংলাদেশের বঙ্গালদের ভাষা পবিত্র কিংবা নেক হয়ে গেছে। দু-একজন কবি-প্রাবন্ধিক-পণ্ডিত বাংলাদেশের বাংলাতে বেশকিছু আরবি-ফারসির ভেজাল আনতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা 'আতর' না হয়ে 'ভেজাল' হিসেবেই গণ্য হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে বাংলাদেশের 'পানি'কে কিছুতেই আর 'জল' করা যাচ্ছে না, 'দাওয়াত'কে করতে পারছি না 'নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ)', 'দোয়া'কে করা যাচ্ছে না 'আশীর্বাদ'। কেন এমন হল তা বিচার-বিবেচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সমাজ-ভাষাতত্ত্বের (socio-linguistics) গহিনে-গভীরে এবং দেখতে হবে ইতিহাসের কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের বঙ্গালরা তাদের মুখের ভাষাকেও জাতপাতকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল বিদ্রোহের অস্ত্র হিসেবে। বাংলা বানানসংস্কারকে কেন্দ্র করে প্রত্ন-ভাষাতত্ত্বের গহিন-গভীরে আপাতত যেতে চাই না, তবে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষাতে ভিন্ন মাত্রার সিনট্যাক্স ও সেমানটিক্স কাজ করছে। বাংলাভাষায় কথা বললেও আমরা এখনও পশ্চিমবাংলার অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে পারি না। (উদাহরণ : ছেঁচকি, ঘণ্ট, বড়ি, শুক্তানি, ডালনা, ধোঁকা, হিঙ্গি, দোলমা, দমপক্ত, অম্বল, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, ছাঁদনাতলা, অশৌচ, পাঁচালি, জয়মঙ্গল, কালরাত্রি ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী লোকজনও বাংলাদেশের

বহুলব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না (উদাহরণ : আক্‌দ, ওয়ালিমা, রুকু, পারা, হাদিয়া, হেবা, শরিয়ত, মারেফত, তাহাজ্জুত, জানাজা, ওয়াজেব, খাট্টা, হিদল, লইট্টা ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের বাংলাভাষাকে বিশ্লেষণ করে একথা বলা হয়তো সঙ্গত হবে যে কোনোদিন কমপিউটারে বাংলা স্পেল-চেক সফ্‌টওয়্যার তৈরি হলেও আমাদের লিখতে হবে–বাংলা : পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলা : বাংলাদেশ। আমার বক্তব্য পড়ে কলিম হয়তো ভাববেন যে আমি বাংলা বানানের সমতাবিধানকে আরও আটকে দিলাম। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়; আমি আসলে চাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা একটি একক চেতনাকাঠামোর (Paradigm) ওপরে দাঁড়িয়ে বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধান করুন এবং তাঁরা গতিশীল বাংলাভাষার রূপ ও স্বরূপকে দেশকাল-গ্রাহ্য করে চৈতন্যের গতি নিয়ে অনুধাবন করতে শিখুন।

তিন.

বাংলাভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাচ্ছে না কেন?

কলিম এ-পর্যায়ে লিখেছেন : "একালের ভাষাবিধায়কদের কথাবার্তা নির্দেশাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার হল–সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের হাত থেকে বর্তমান বাংলাভাষার মুক্তিসাধন। তার মানে বাংলাভাষার ব্যবহার থেকে, চর্চা থেকে, অভিধান থেকে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ ও সাধু শব্দসমূহ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে। বর্তমানে যাঁরা বাংলাভাষার 'প্রয়োজনীয় সংস্কার' করতে চাইছেন, তাঁদের বাসনা এই।" কলিমের বক্তব্য পড়ে আমার মনে দুটো প্রশ্ন জেগেছে, প্রশ্নদুটো হল : ভাষা থেকে শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন, এমন দক্ষ ভাষা-ঝাড়ুদার আছেন কি? ভাষা থেকে শব্দ মুছে ফেলা কিংবা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা আদৌ সম্ভব কি? আমি জানি কলিম এবার স্বীকার করবেন যে ভাষা থেকে শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন, এমন দক্ষ ঝাড়ুদার পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশে নেই এবং এমন কাজ করা সম্ভবও নয়। তবে এ-প্রসঙ্গে আমার একটা ভিন্নমত আছে, আমি বলব : বাংলাভাষার সম্পদ হিসেবে সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি সব শব্দই থাকুক, এবং এই শব্দগুলোকে আমরা শুধু 'বাংলা'-শব্দ হিসেবেই অভিধানভুক্ত করব। শব্দগুলোর মূলে বা উৎসে কোন ধাতু/প্রত্যয়/বিভক্তি বচন ইত্যাদি আছে তা জানার জন্য উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে 'উচ্চতর বাংলা' নামে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং ঐ উচ্চতর বাংলা পড়ে ছাত্ররা জানবে–'শিল্পিন্ শব্দ কর্তৃকারকে একবচনে প্রথমা বিভক্তি সহযোগে শিল্পী হয়।'

আমি আরও বলব, বাংলা বানানের সমতাবিধানের জন্য ঐতিহ্যনির্ভর বাংলা বানানকেই গ্রহণ করা উচিত, ভাষার ঐতিহ্যের সাথে সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধ-তৎসম ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে আনা অর্থহীন। বাংলা বানানের ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে গাড়ী, বাড়ী, নারী, শিল্পী, কাহিনী ইত্যাদি রেখে দেয়া যেতে পারে। তবে বাংলা বানানের সমতাবিধানের জন্য বাংলা শব্দ হিসেবেই কোনো কোনো শব্দের বানান নতুনভাবে লেখা যেতে পারে, কিন্তু এই সমতাবিধান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের প্রসঙ্গ টানা যাবে না।

বাংলা বানানের সমতাবিধান করতে গিয়ে সুনীলবাবু জানিয়েছেন : "পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদুটি দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু...পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ছবি যখন-তখন মনে আনা শোভন বা

রুচিসঙ্গত নয়।" কলিম এ-পর্যায়ে সুনীলের বিরোধিতা করেছেন এবং আমিও বলতে চাই, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদুটি আমার কাছে কখনোই দৃষ্টিকটু বা শ্রবণকটু মনে হয়নি, আমার মনে এই শব্দদুটোর মাধ্যমে পুরুষাঙ্গ বা যোনির ছবি আসেনি। আমি বা আমার বন্ধুবান্ধব যখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের লিঙ্গ-পরিবর্তন শিখতে হয়েছিল। কিন্তু আমার কিংবা আমার বন্ধুবান্ধবদের মনে কোনোরকম 'অশ্লীল' চিন্তাভাবনা আসেনি, যদিও মাঝে মধ্যে আমরা 'উত্তম'-এর স্ত্রীলিঙ্গ 'সুচিত্রা' বলতাম।

কলিম কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন : "কিন্তু তা হলে তো খোদ 'ভগবান'কেই বাদ দিয়ে দিতে হবে। কারণ শব্দটির ভিতরে 'ভগ' রয়েছে। নিশ্চয়ই কথাটি তাঁর মনে (সুনীলের) 'শোভন ও রুচিসম্মত' ছবি আনছে না। রইল বাকি আলিঙ্গন, লিঙ্গপূজা, লিঙ্গদেব, লিঙ্গায়েৎ, অমৃতালিঙ্গম, নিজলিঙ্গাপ্পা, যোনি, ব্রহ্মযোনি, অযোনিসম্ভবা, ভগবতী, সুভগা, ভগবদ্‌গীতা, ভগিনী, স্তন, কুচ, চূচুক, পয়োধর, জঙ্ঘা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, জানু, আজানুলম্বিত, রমণী, রমণীয়, রমণীমোহন, রাধারমণ, সঙ্গম, ত্রিবেণীসঙ্গম, সাগরসঙ্গম, রতি, আরতি, বিরতি, রতিকান্ত, রতিবিলাপ, রন্ধনশালা, পাঠশালা ইত্যাদি অজস্র 'দৃষ্টিকটু ও শ্রবণকটু' শব্দের কথা।" কলিমের শব্দের লিস্ট দেখে আমার 'ধান ভানতে শীবের গীত গাওয়ার' কথা মনে হয়েছে, কারণ ভগবান, ভগবতী, ভগিনী ইত্যাদি শব্দের মাঝে যে স্ত্রীঅঙ্গ 'ভগ' আছে তা আবারও আমি বুঝতে পারলাম কলিমের কল্যাণে।

কলিম-লিখিত অন্যান্য শব্দে যে অশ্লীলতা আছে তা-ও জানা গেল প্রথমবারের মতো। ভাষার শব্দভাণ্ডারে যে-শব্দগুলো আমাদের ঐতিহ্যগ্রাহ্য করে মনের ভাব প্রকাশের জন্য গ্রন্থিত হয়েছে এবং যে-শব্দগুলো কোনোরকম অশ্লীল চিন্তাভাবনা ছাড়াই বহুলব্যবহৃত, তার মাঝে অশ্লীলতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র সুনীলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্যই, অন্য কোনো কারণে নয়। কলিম খান এ-পর্যায়ে এসে 'লিঙ্গ' শব্দটির প্রকৃত অর্থের এক বিশাল বর্ণনা দিয়েছেন। লিঙ্গ শব্দটির অর্থ যে 'যার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়' তা-ও জানা গেল এবং আমরা আরও জানলাম যে 'জানা' বা 'জ্ঞ' বা 'জ্ঞান'-এর সাথে Quantum Mechanics-এর যোগসূত্র রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানবিক চেতনা-চৈতন্যের সাথে Quantum Mechanics-এর যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছি, বুঝতে চেয়েছি মানুষের মস্তিষ্কে কী ধরনের Electro-chemical ও Quantum Mechanical ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়, কিন্তু এ-ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট সমাধান পাইনি। এ-ব্যাপারে পৃথিবীবিখ্যাত পদার্থবিদ রোজার পেনরোজ-এর বক্তব্য হল :"There is certainly a puzzle for any 'ordinary' quantum description of our brains, since the actions of 'observation' is taken to be an essential ingredient of the valid interpretations of conventional quantum theory. Is the brain to be regarded as 'observing itself' whenever a thought or perception emerges into concious awareness? The conventional theory leaves us with no clear rule as to how quantum mechanics could take this into account, and thereby apply to the brain as a whole. I have attempted to formulate a criterion for the onset of R (State Vector Reduction) which is quite

independent of consciousness (the 'one gravitron criterion') and if something like this could be developed into a fully choherent theory, then there might emerge a way of providing a quantum description of brain, more clearly than that exist at present."

যাই হোক, সবশেষে ভাষার শব্দ নিয়ে আমার একটাই বক্তব্য : অযথা বাংলাভাষার বহুলব্যবহৃত শব্দগুলোর মাঝে 'অশ্লীলতা' খোঁজা ঠিক হবে না। কেউ যদি এমন কাজ করেন তবে তা ভাষাতত্ত্বের বিষয় হবে না, বিষয়টি হয়ে যাবে ফ্রয়েড বা লাঁকা-কথিত অবদমিত কামনা-বাসনার মনস্তত্ত্ব।

'বাংলাভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাচ্ছে না কেন?'–এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সবশেষে কলিম লিখেছেন : "মোট কথা, বানানের সমতাবিধান করতে গেলে আটকাচ্ছে বাংলার অতীত, বাংলাভাষার ওপর চেপে বসে থাকা সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম। সংসারের সব দায় সামলাবেন বউমা, কিন্তু সেই দায় সামলাতে গিয়ে কোনো কিছু তিনি সহজ সরল করে নিজের সুবিধামতো করে নিতে পারবেন না। তিনি যা-ই করুন, তাঁর ক্রিয়াগুলিকে অবশ্যই শাশুড়ির (সংস্কৃত ব্যাকরণের) দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। ... বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত বিবাদ এখন এভাবেই শাশুড়ি-বউয়ের মহৎ কাজিয়ায় পরিণত হয়েছে। এই কাজিয়া চললে ভাষা-সংস্কার হবে কীভাবে?"

কলিমের বক্তব্যের উত্তরে আমি বলব, বাংলাভাষা যদি 'বউমা' হয় তবে 'সংস্কৃত' আসলেই তার শাশুড়ি কি না, সেটাই আমাদের আগে দেখতে হবে। আমার তো মনে হয় 'সংস্কৃত' বাংলা 'বউমা'র শাশুড়ির মাসির শাশুড়ির মতো সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করছে। আমরা যদি আমাদের ভাষার চলতিরীতির শব্দভাণ্ডারের হিসেব-নিকেশ করি তবে দেখতে পাব এতে শতকরা সত্তরটি তদ্ভব, দশটি তৎসম, পাঁচটি অর্ধ-তৎসম, পাঁচটি খাঁটি দেশজ, আটটি বিদেশি ভাষার ও দুটি অজ্ঞাতমূল ভাষার শব্দ রয়েছে। চলতি বাংলাভাষায় তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য একথাই প্রমাণ করে যে বাংলাভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বিবর্তনে বর্তমান রূপ নিয়েছে। ভাষার প্রত্ন-ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত ছিল এক স্থবির ও গতিহীন ভাষা, যা থেকে নতুন কোনো ভাষার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। পতঞ্জলি সংস্কৃতভাষাকে শিষ্ট সমাজের ভাষা হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

সংস্কৃতভাষা যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের শিষ্ট ভাষা ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠে বোঝা যায়। রামায়ণে বলা হয়েছে :

ধারায়ণ্ ব্রাহ্মণরূপসিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥
(সেই নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে, সংস্কৃত বলে, শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করত)
[অরণ্যকাণ্ড, ১১ সর্গ]

অশোকবনে সীতাকে দেখে হনুমান ভাবছে :
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম।

রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥
অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা ॥
(যদি আমি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তা হলে সীতা আমাকে রাবণ ভেবে ভয় পাবে। সুতরাং অর্থবান মানুষ-বাক্য বলা প্রয়োজন। যদি তা না করি তবে এই অনিন্দিতা সীতাকে সান্ত্বনা দিতে পারব না)
[সুন্দরকাণ্ড, ৩০ সর্গ]

উল্লিখিত পদগুলো পড়লে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত ছিল শিষ্টসমাজের ভাষা আর 'মানুষ-বাক্য' বা সংস্কৃতের অপভ্রংশ ছিল মানুষের মুখের ভাষা।

সংস্কৃতভাষার সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক যে অনেক দূরের তা ভাষা বিশ্লেষণ করেই বোঝা যায়। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল, যা থেকে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে :

বাংলা শব্দ	প্রাকৃত শব্দ	সংস্কৃত শব্দ
দেখে	দিক খই	পশ্যাতি
বাপ	বপ্প	পিতঃ
গাছ	গচ্ছ	বৃক্ষ
মাথা	মত্থঅ	মস্তক
শোনে	সুনই	শৃনোতি
হাত	হত্থ	হস্ত

'আমি দেখি, তুমি আছ'–এই বাক্যটির সংস্কৃত রূপ হবে 'বয়ং পশ্যামঃ (অহং পশ্যামি), য়ুয়ং স্থ (ত্বম্ অসি)'; প্রাকৃতে হবে 'অম্হে দেক্খীঅই, তুম্হে অচ্ছহ'। উদাহরণগুলো ভালো করে তাকিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি যে 'সংস্কৃত' আমাদের ভাষার নিকট-আত্মীয় নয়, বরং 'প্রাকৃত' হল বাংলাভাষার খুবই নিকট কুটুম। বাংলাভাষা কোন ভাষা থেকে এল তা নিয়ে অবশ্য এখনও পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হেমচন্দ্র প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতরা ভাবতেন যে বাংলাভাষা এসেছে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাবিদরা মনে করেন, বাংলাভাষার সৃষ্টি হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের মাধ্যমে। ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ প্রায় একমত যে বাংলাভাষা সংস্কৃত কিংবা মাগধী প্রাকৃত থেকে আসেনি, বাংলাভাষার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের মাধ্যমে। এখানে বলা আবশ্যক যে কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পৈঙ্গলে গৌর অপভ্রংশের যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তার সাথে আমাদের বর্তমান বাংলাভাষার মিল রয়েছে। বাংলাভাষা যে গৌড় প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের মাধ্যমে এসেছে তার প্রমাণ আরও পাওয়া যায় দণ্ডির কাব্যাদর্শে। তিনি লিখেছিলেন :
শৌর সেনীচ গৌড়ীচ লাটি-চান্যাচ তাদৃশী।
খাতি প্রাকৃতামত্যেবং ব্যবহারেষু সান্নিধ্যম ॥

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বাংলাভাষা সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসেনি। সংস্কৃতের মতো একটি ভাষা, যা ছিল প্রচণ্ডভাবে গতিহীন এবং যাতে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বা পদক্রমের কোনোরকম পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না, তা থেকে বাংলাভাষার উদ্ভব হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে সংস্কৃতভাষার সাথে বাংলাভাষার একটা দূরের সম্পর্ক রয়েছে এবং সম্পর্কটিকে দেখানো যায় এভাবে :

প্রাচীন ভারতীয় আর্য: সংস্কৃত (অপরিবর্তনীয়)

আদিম প্রাকৃত

প্রাচীন প্রাকৃত

প্রাকৃত অপভ্রংশ

বাংলা

আমরা যদি বাংলাভাষার উল্লিখিত সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করি তবে 'সংস্কৃত' বাংলা-বউমার শাশুড়ির শাশুড়ির শাশুড়ির শাশুড়ি-জাতীয় সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করছে বলা যায়। কলিম যে বললেন : বাংলাভাষার (বউমার) শাশুড়ি সংস্কৃত, তা মনে হচ্ছে সঠিক নয়।

বাংলাভাষা কোথা থেকে এল, কিভাবে এল, এ নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা সংস্কৃত পণ্ডিতরা করেননি। তাঁরা যেহেতু বাংলা বলতেন, সেহেতু তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ছিল বাংলাভাষাটিকেও দেব-ভাষা/শিষ্ট ভাষা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ পাদরি মনোয়ল দা আস্‌সুম্পসাঁও পূর্ববাংলার ভাওয়াল পরগনার নাগরী গ্রামে বসে, লোকজনের মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে, প্রথম বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাস্‌সে হালহেড "A Grammar of the Bengal Language" প্রকাশ করেন এবং বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল–"What the pure Hindastanic is to upper India, the language which I have here endeavoured to explain is to Bengal, intimately related to Shanscrit both in expression, construction and character. It is the sole channel of personal and epistolary communication among the Hindoos of every occupation and tribe." হালহেড-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বাংলাকে সংস্কৃতের প্রায় কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর এই ধারণা হয়তো-বা হয়েছিল সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাথে কথাবার্তা বলার ফলে। হালহেড যে তার ব্যাকরণ রচনার সময় সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়েছিলেন, সেকথা গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখও করেছেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (বাংলা ব্যাকরণ নয়) প্রকাশ করেন ১৮৩৩ সালে এবং তার পরের ব্যাকরণগুলো রচিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্), ১৯৩৯ সালে (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) এবং ১৯৯৬ সালে (জ্যোতিভূষণ চাকী)।

বাংলাভাষাকে সংস্কৃতভাষার মতো একটি শিষ্ট ভাষা বানানোর জন্যই সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলাভাষার ব্যাকরণের সাথে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভেজাল মিশিয়ে দেন এবং এর ফলে বাংলা বর্ণমালায় উপস্থিত হয় ঋ, ঌ, দীর্ঘ ঌ, অং, অঃ এবং অন্তঃস্থ ব। পরবর্তী পর্যায়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাণিনি ব্যাকরণ অনুসরণ করে 'দীর্ঘ ঌ' ও 'ক্ষ' বাদ দেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত 'ঋ' বর্ণটিকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। বাংলাভাষার উচ্চারণ অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালায় য়, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ যোগ করেন, যা তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা বর্ণমালা সংস্কার-এর বহু পরে বাংলা বর্ণমালা থেকে 'ঌ' বর্ণটিকেও বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তার পরে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ-পর্ষদ, অ্যাকাডেমি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বাংলাভাষার সংস্কার ও বাংলা বানানের সমতাবিধানের চেষ্টা করলেও তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। ফলে, বাংলাভাষাতে এখনও বিরাজ করছে একধরনের বানান-নৈরাজ্য।

বাংলাভাষায় 'বানান-নৈরাজ্য' থাকার প্রধান কারণটি হল, বাংলাভাষার সঠিক ও দেশকালগ্রাহ্য ব্যাকরণ এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি, আমাদের ভাষার কাঁধে 'সিন্দাবাদের স্কন্দ-ভূত'এর মতো চেপে বসে আছে সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণের ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি বাংলা ব্যাকরণ ও বানানকে বিদঘুটে করে রেখেছে। বাংলা ভাষার 'ন' ও 'ণ' এখন হয়ে গেছে চোখে দেখার মতো একটি বিষয়, আমাদের মুখের ভাষার উচ্চারণের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। ঠিক একই অবস্থা বিরাজ করছে 'স', 'শ' ও 'ষ'-কে নিয়ে। কলকাতা ও বিহারের লোকজন 'স'-এর উচ্চারণ কিছুটা জানলেও, বাকি সব বাংলাভাষীর কাছে 'শ'-ই হয়ে আছে উচ্চারণের ধ্রুবক। এমন অবস্থায় আমরা শুধুমাত্র 'ন', 'স' ও 'শ' আমাদের বর্ণমালায় রাখব কি না, তা ভেবে দেখতে হবে আবার। বাংলাভাষা শেখানোর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হ্রস্ব, দীর্ঘ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, তালব্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য, মূর্ধা, উষ্ম ইত্যাদির মতো ধ্বনিমূল শেখানো আদৌ সম্ভব কি না, কিংবা সংস্কৃত-টোল-এর মতো পণ্ডিত শিক্ষক আমরা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য পাব কি না, এ-ব্যাপারগুলোও ভেবে দেখা উচিত।

'ধপ্ করিয়া পড়ে' না 'পড়িয়া ধপ্ করে', এ-বিষয়ে নাকি সংস্কৃত পণ্ডিতদের মাঝে প্রচুর মতভেদ আছে। আমরা যারা বাংলাভাষী, তারা এখনও 'ধপ্ করিয়া পড়ি' এবং সংস্কৃতজাত বাংলা কারক নিয়ে চিন্তিত হই। 'দিলে কর্মকারক আর দান করিলে সম্প্রদান কারক', এমন 'পণ্ডিতি' বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। বাংলা কর্ম ও সম্প্রদান কারকে বিভক্তি-চিহ্ন এক, আলাদা কিছু নয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত ভাষার 'অঃ' ও 'অস'- কে চিন্তায় রেখে বাংলা ব্যাকরণেও অযথা সম্প্রদান কারক আনা হয়েছে। রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বাংলাভাষায় সম্প্রদান ও অপাদান কারক রাখার বিরোধিতা করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় সম্প্রদান কারক রাখার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তার পরেও জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর রচিত 'বাংলাভাষার ব্যাকরণ'-এ ছয়টি কারক রেখে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দাবি সংরক্ষণ করেছেন মাত্র।

সংস্কৃতে দার, কলত্র ও স্ত্রী—এই তিনটি শব্দের অর্থ একই, বউ। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে পড়ে দার হয়েছে পুংলিঙ্গ, কলত্র হয়েছে ক্লীব আর স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গই আছে। বাংলায় যে লিঙ্গবিভ্রাট রয়েছে, তার মূলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ। বিশেষ্য বা বিশেষণে যেখানে-সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ডাক্তার, আচার্য, চিকিৎসক, কবি ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করা যায় কি? আচার্য শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কি আচার্যানী (আচার্যানীর অর্থ তো

আচার্যের পত্নী)? স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' হবে (ধোবানী, বাঘিনী ইত্যাদি), কিন্তু কিছু শব্দে 'ই' হবে (ঝি, দিদি, বিবি ইত্যাদি)–এমন বিধান দেওয়া কি নৈরাজ্য নয়? সুন্দর বউ বলা কি যায় না? অধ্যাপক মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অধ্যাপক শিরীন আক্তার বলা কি যায়? নাকি অধ্যাপিকা বলতেই হবে? এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন, নয়তো বানানবিভ্রাটের সমাধান হবে না।

বাংলাভাষার বচনও একটা সমস্যা বটে। সংস্কৃতের অনুকরণে বিংশতিতম, ত্রয়োবিংশতিতম, ঊনচত্বারিংশ, একসপ্ততিতম ইত্যাদি ব্যবহার না করে অবশ্যই বিশতম, তিরিশতম ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কলিম খান বাংলা বানানের সমতাবিধান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃতকে বাংলাভাষার নিকট কুটুম বানিয়ে দিলেন এবং সেটা করতে গিয়ে বাংলা ব্যাকরণের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে গিয়েই বাংলা-সংস্কৃত সম্পর্ক ও বাংলা ব্যাকরণের পরিবর্তন/পরিমার্জন নিয়ে আমাকে বেশ কিছু লিখতে হল।

চার.

ভাষা-সংস্কার নিয়ে কাজিয়ার মূলে কী রয়েছে?

কলিম খানের প্রবন্ধ পড়ে জানতে পেরেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা-বিষয়ক ভাবনার অংশবিশেষ। সুনীল বলেছেন : "সব শব্দই এক একটি ছবি আনে আমাদের মানসে, যেমন আকাশ, যেমন নদী, যেমন হরিণ ইত্যাদি।" সুনীলের বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেননি কলিম, তিনি লিখলেন : "ভালো করে ভেবে দেখুন তো, হরিণ বললে যে-ছবিটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে সেটি 'হরিণ' মাত্র, নাকি 'হরিণ চরছে', বা 'হরিণ ছুটছে, 'হরিণ তাকিয়ে আছে'–এই-জাতীয় কি না? আকাশ বললে শুধুই 'আকাশ' দেখি, নাকি 'আকাশ শোভা পাচ্ছে' দেখি? নদী বললেই-বা ঠিক কীরকম ছবি মাথার ভিতরে দেখা দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরই হল সর্বভাষার একেবারে গোড়াকার প্রশ্ন। নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নের উত্তর হল, আমরা 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী' দেখি।"

শব্দ বা ভাষা-প্রতীক নিয়ে সুনীল আর কলিম যা বললেন, তা মোটেও প্রাচীন কিংবা আধুনিক ভাষাদর্শনের তত্ত্বকে গ্রাহ্য করে না। ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো অর্থ নেই, যদি-না তা একটি দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত হয়। যে-জন্মান্ধ আকাশ দেখেনি তার কাছে 'আকাশ' অর্থ 'বাতাস' (কারণ সে কেবলমাত্র বাতাসের ছোঁয়া স্পর্শ-ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝে), যে-লোক হরিণ দেখেনি বা হরিণ সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে কীভাবে বলবে হরিণ কী কী করে? নদীর অর্থও কি আমরা বুঝব, যদি পদ্মা, মেঘনা কিংবা যমুনার মতো নদী না দেখি? শব্দের অর্থ যদি দেশকালকে কেন্দ্র করে, বাক্যের পরম্পরা রক্ষা করে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রার দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত না হত, তবে কি আমরা বলতে পারতাম–'মনের আকাশ', 'দুঃখের নদী', 'সোনার হরিণ' ইত্যাদি? আসলে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাদর্শন বলুন আর সস্যুর, দেরিদা, হাইডেগার, হ্বিটগেনেস্টাইন, ফ্রেগে প্রমুখের ভাষাদর্শনই বলুন আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই; দেশকালকে গ্রাহ্য করে, বাক্যগঠনের ওপর নির্ভর করে, একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। আর কলিম যে বললেন, শব্দ

উচ্চারণ করলেই আমরা 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে দেখি, তা কোনো অবস্থাতেই ভাষাদর্শনের বিষয় নয়, হয়তো-বা কোনো-এক Fantasy-র বিষয় । কলিমের বক্তব্য অনুযায়ী যদি উচ্চারিত হয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', তবে কি দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ বসে বসে কবিতা লিখছেন অথবা তিনি স্বর্গে বিচরণ করছেন? নাকি কলিমের "কোনোও ক্রিয়া না-থাকলে 'থাকা' ক্রিয়া থাকবেই"–মেনে নিয়ে ভাবব–রবীন্দ্রনাথ আছেন? যদি সুনীলের কবিতায় ভুল করে এসে যায় 'স্ত ন' শব্দটি, তবে তার ক্রিয়া কী দেখব? লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ম্যাডোনাকে ক্রিয়ারত দেখব, নাকি দেখতে হবে বাৎস্যায়নের দর্শন? আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে আমি শব্দের বিপরীতে 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে আনি, কিন্তু ভাবতে পারছি কলিম ভাষাতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন । ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা প্রসঙ্গে কলিম এনেছেন David Bohm-কে এবং লিখেছেন : "বিজ্ঞানীরা (ডেভিড বোহ্ম-এর) গ্রন্থটিকে গুরুত্ব দেননি সম্ভবত ভাষা ও দর্শনের ব্যাপার বলে, আর ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা একে গুরুত্ব দেননি পদার্থবিজ্ঞানী লিখেছেন বলে ।...ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা ও অখণ্ড দর্শনের নবরূপে ফিরে আসার আগমনী গানটি তিনিই প্রথম গেয়ে গেছেন । ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার কথা এ-যাবৎ আর কারো রচনায় পাওয়া যায়নি ।" কলিমের লেখা পড়ে আমার আশ্চর্য লেগেছে, পদার্থবিজ্ঞানী কি দর্শন লেখেননি আগে? হাইজেনবার্গের Physics and Philosophy তো বিখ্যাত দার্শনিক বই, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হ্বিটগেনেস্টাইন-এর Tractatus Logico-Philosophicus আর Philosophical Investigation নিয়ে এখনও গবেষণা হচ্ছে । ফ্রয়েড আর লাকা ছিলেন ডাক্তার, রাসেল ও ফ্রেগে ছিলেন গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী আর্নস্ট মাখ, মরিশ শ্লিক, হ্যানস্ হ্যান, অটো ন্যুরেথ, পপার, কুন, ফেয়েরাবেন্ড, লাকাতোস, মাস্টারম্যান প্রমুখ তো দর্শনচর্চা করেছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে আধুনিক Philosophy of Science নিয়ে তো আলোচনা করা সম্ভবও নয় । আমার মনে হয় 'ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার আগমনী গান' গাওয়ার জন্যই ডেভিড বোহ্ম ভাষাদার্শনিক হিসেবে আলোচিত হননি বেশি ।

কলিম বলেছেন : "আমরা ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারীকে দেখি' এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উত্তরও তা-ই ।" তিনি আরও বলেন : "আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের সময়ের সঙ্গে আমাদের সময়ের বিস্তর ফারাক ঘটে গেছে । আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাভাষা এখন কার্যত দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে–বিশেষ্যভিত্তিক (লোগোসেন্ট্রিক) বাংলাভাষা ও ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষা ।" মন্তব্যগুলো করে কলিম ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা নিয়ে প্রচুর বাক্‌বিস্তার করেছেন, কিন্তু যা বলেছেন তার সাথে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কিংবা প্রাচীন বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না । আমরা জানি যে জ্ঞানবিদ্যার উপাদান হিসেবে ভাষা ও শব্দের ব্যাখ্যা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছিল । বেদান্ত দর্শনে 'শব্দবোধে'র কারণকে 'শব্দপ্রমাণ' বলা হত, একটি বাক্যের তাৎপর্য বা অর্থ অন্য কোনো প্রমাণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হলে, তাকে বলা হত 'বাক্য-প্রমাণ' (যস্য বাক্যস্য তাৎপর্যবিষয়ীভূতসংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে তদ্বাব্যং প্রমাণম্) । পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, বাদরায়ণ, মণ্ডনমিশ্র, নাগেশ ভট্ট প্রমুখের দর্শনে 'স্ফোটতত্ত্ব' প্রাধান্য পেয়েছে । নাগেশ ভট্ট মনে করতেন, শব্দের 'স্ফোট-জ্ঞান' হল একধরনের অপরোক্ষ চেতনা মাত্র, যার কোনো পূর্বাপর নেই । মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে, দৈবী বাক্ (ধ্বনি)-ই আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্মা ও বাক্ এক

ও অভিন্ন সত্তা। উপনিষদে বাক্-রূপ ব্রহ্মকে আকাশের মতো বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত শব্দব্রহ্ম, লাটিন Verbum Logus ও ইংরেজি word শব্দের মূলে রয়েছে এক অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম, যা আধুনিক কালে জাক দেরিদার দর্শনে এসেছে শব্দব্রহ্মবাদ কিংবা logocentrism-এর ধারণা বা concept নিয়ে। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শনসহ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে প্রতিটি শব্দের বিপরীতে কোনো-একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের উপস্থিতি কল্পনা করা হত। বিষয়টি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ছিল প্রচণ্ডভাবে logocentric, যা কলিমের বর্তমান চিন্তার বিপরীতেই অবস্থান নেয়। তবে একথাও সত্য, কোনো-কোনো প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বুঝতে পেরেছিলেন যে 'শব্দ' নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা বিষয়কে বোঝায় না। এ-প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্ট বলেন : নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বং জাতিত্বম্, অর্থাৎ, শব্দের জাতিবাচক ধারণা নিত্য এবং এ-কারণে নির্দিষ্ট কিছুকে শব্দ দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে–'বাক্যজন্য জ্ঞানে চ আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসতিত্তাৎ-পর্যজ্ঞানঞ্চেতি চত্তারি কারণানি', যার অর্থ হল শব্দ দিয়ে তৈরি করা বাক্যের অর্থ তার আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি ও তাৎপর্যজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। ধর্মকীর্তি বলেন : তস্মাৎ গ্রাহ্যে অর্থে বস্তুরূপে যদবিপর্য্যস্তম তদাভ্রান্তমিহ বেদিতব্যম্, অর্থাৎ, ভুলভাবে জ্ঞান আহরণ করলে তা দিয়ে বস্তুসম্পর্কীয় সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং এমন জ্ঞানকে সঠিক জ্ঞানও বলা যাবে না। ধর্মকীর্তির এই শ্লোকটি বোধহয় কলিম খান-এর জন্য প্রযোজ্য এবং এ-কারণে তাঁর ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার আর কিছু বলার নেই।

পাঁচ.

কী আছে বিধাতার মনে!

Metaphysical বিধাতার মনে কী যে আছে, তা আমার জানা নেই। তবে এটা বুঝতে পারি যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে হবে, ভাষা-সংস্কার করতে হবে এবং বাংলা বানানে সবধরনের গোঁজামিল, অসমতা, বিভ্রাট ও নৈরাজ্য দূর করতে হবে। তবে এ-কাজটি করতে হলে পণ্ডিত ভাষাতাত্ত্বিকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাংলাভাষা সংস্কৃত ভাষার 'বৌমা' নয়।

কলিম এ-পর্যায়ে এসে লিখেছেন : "পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় শব্দের বর্ণেরা (ধ্বনিরা) মানে ধারণ করে না। এটিই বিশ্বের সমস্ত ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলাভাষার মূল ও প্রধান পার্থক্য।" আচ্ছা, যদি ব্যাপারটা এই হয় তবে কলিম আমাকে বলবেন কি, শ্রবণ, শ্রাবণ, প্লাবন, প্রাশন, লবণ–এই শব্দগুলোর মাঝে যে 'ন' ও 'ণ' আছে, তার উচ্চারণে পার্থক্য কী? মন ও মণ-এর 'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণ কি আলাদা? 'শেষ' ও 'দেশ'-এর 'ষ' ও 'শ'-এর উচ্চারণ কি একই রকম না? যদি আমি ভুল করে লিখি, 'শ্রাবন মাসে প্লাবণ এশে আমার দেসকে ভাশিয়ে দিল'–তবে কি বাক্যটার অর্থ বদলে যাবে? 'কলিম' শব্দটি তো আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ক্বালিম' হবে, তাতে কি কলিম খান 'ক্বালিম খান' হবেন?

যাই হোক, আমরা যেহেতু এখন আর 'হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্বক অন্নগ্রহণ' করতে বসি না, বলি না 'গম্ভীর অম্বরে যথা/নাদে কাদম্বিনী' এবং খুব সহজেই লিখে ফেলি 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/নদেয় এল বান', সেহেতু আমাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি কোনো এক তত্ত্বকে দাঁড়

করিয়ে বাংলাভাষার নব্য-ব্যাকরণ রচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে এই নব্য-ব্যাকরণের একটি অংশে অবশ্যই প্রাচীন বাংলাভাষার অনুশাসনমূলক (Prescriptive) বিধান থাকতে পারে, তবে বর্ণনামূলক (Descriptive) অংশটি হবে আমাদের বর্তমানের ভাষা উচ্চারণ ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।

কলিম খান 'পত্র', 'পত্ত্র' ও 'আচার্য্য', 'আচার্য' শব্দগুলো ব্যাখ্যা করেছেন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তার দিকে খেয়াল রেখে। বাংলাভাষায় যে 'পত্ত্র' উচ্চারণের একটি শব্দ আছে, তা আমার জানা ছিল না, কোনোদিন ব্যবহার করার প্রয়োজনও হয়নি। পত্র শব্দটির ব্যবহার এখন সংবাদপত্র, দলিলপত্র, চিঠিপত্র এবং পত্রপাঠ বিদায় করার মাঝেই সীমাবদ্ধ। আমি 'পত্র'কে এখন 'চিঠি' বলি এবং প্রয়োজনীয় 'চিঠি'গুলোকে 'পত্ত্র' হিসেবে সংরক্ষণ করি। আচার্য্য ও আচার্য শব্দের পেছনে যে এত সুতো, ফলক ও লোগো আছে তাও আমার জানা ছিল না (আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন মূর্খ প্রকৌশল-বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ব আমার জানার কথাও নয়; ভাষা নিয়ে অল্পস্বল্প যা জানি, তাতে সুতো, ফলক ও লোগো নেই।) তবে আমার মনে হয়, যে 'আচার্য', তাঁকে 'য' দিয়ে ডাকি আর না-ডাকি, তাতে খুব একটা আসে যায় না। বাংলাদেশে তো 'আচার্য' শব্দটি ব্যবহার হয় না বললেই চলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখন হয়ে গেছেন 'ভিসি', আর শিক্ষকরা হয়ে গেছেন 'প্রফেসর'। যদিও অধ্যাপক/অধ্যাপিকা শব্দগুলো এখনও চালু আছে।

ছয়.

এখন তা হলে কী করি!

বাংলাভাষা এখন খুবই গতিশীল ভাষা। আমাদের ভাষার অন্তরে জ্বলছে আগুন, আমরা টের পাচ্ছি আগুনের আঁচ। ভাষার এই 'আগুন' ও 'আঁচ' গ্রাহ্য করেই আমাদের ভাষা-সংস্কার কিংবা বানান-সংস্কার করতে হবে, লিখতে হবে বাংলাভাষার নতুন ব্যাকরণ।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, তার পরও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কারণে বাংলাদেশের লোকজন এখন হিন্দি ভাষাও বোঝে। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাশ' এখন হারিয়ে যাচ্ছে মুম্বাই-এর সঞ্জয় লীলা বনসালীর 'দেবদাশ'-এর কারণে। তার পরেও আমি বলব, বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাংলাদেশের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে, তাতে ওখানে 'বাংলাভাষা সংরক্ষণে'র উদ্যোগ নেওয়া উচিত। গত তিরিশ বছর যাবৎ আমি কলকাতা, দিল্লি যাচ্ছি-আসছি এবং আমার চোখের সামনেই ঘটছে বাংলাভাষার পতন। দিল্লির কাশ্মীর গেট, সি আর পার্ক, নয়দার বাঙালিরা এখন বাংলায় প্রশ্ন করলে উত্তর দেন ইংরেজিতে, অনেক সময় হিন্দিতে। সি আর পার্ক-এর এক বাঙালি ভদ্রলোক তো আমাকে বলেই দিয়েছেন : 'বাংলা Language-এ শুধুমাত্র কবিতা আর Tragedy লেখা যায়।' কলকাতার অবস্থাও খুব একটা ভালো না। সর্বভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির অংশ হয়ে, এখন পশ্চিমবঙ্গে চলছে ইংরেজি আর হিন্দি শেখার প্রতিযোগিতা। পার্ক স্ট্রিটের অফিসগুলোতে IIT ও IIM-পাশ করা কর্মকর্তারা বাংলায় কথা বলতে চান না, বললেও তাতে 'ইংহিং' শব্দ থাকে অনেক। আর কলকাতার বাণিজ্য তো অনেক আগে থেকেই হিন্দিভাষীদের দখলে। এমন চলতে থাকলে আগামীতে শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথা বলার জন্য কলেজ স্ট্রিট, কফি-হাউস কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলা বিভাগে আমাদের যেতে

হবে। পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে বাংলাভাষাকে সংরক্ষণ করা যায় তা নিয়েও ভাবতে হবে খান ও গঙ্গোপাধ্যায়দের।

সবশেষে একটা কথা বলি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস', এই বাক্যের সাথে আমি একমত নই। বাংলাভাষী বঙ্গাল মুসলমানদের ঐতিহ্য-ইতিহাসও মক্কা-মদিনায় নয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী জনগণের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে। আমাদের শিকড় খুঁজতে ভাষা ও সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কাজ আরও জোরে চালাতে হবে বৈকি!

সূত্র :

১. আবুল কাসেম, সম্পাদনা, আমাদের ভাষার রূপ, ঢাকা ১৯৬৭
২. কাজী দীন মহম্মদ, বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৭
৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৫৮
৪. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতীয় দর্শন, ঢাকা ১৯৮৩
৫. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন-দিকদর্শন, কলিকাতা ১৯৮৮
৬. রফিকুল ইসলাম, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী, ঢাকা ১৯৮৮
৭. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শন, কলিকাতা ১৬০
৮. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, ঢাকা ১৯৯৭
৯. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, ঢাকা ২০০৪
১০. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা ১৯৯৪
১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলাভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা ১৯৭৪
১২. Halhead, NB, A Grammar of the Bengal Language, Hoogly 1778, Reprint Calcutta 1980
১৩. Penrose, Roger, The Emperor's New Mind, London, 1989
১৪. Lodge, David, Modern Criticism and Theory, New york, 1988

ক লি ম খা ন

আনিলাম অপরিচিতের নাম...

প্রসঙ্গ

ঢাকার আবহমান পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আমার লেখা 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ!?' নিবন্ধটি মান্যবর মঈন চৌধুরীর মনে যে-'প্রতিক্রিয়া'র জন্ম দিয়েছে সেটি আবহমান-এর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শুরুতে দুটি আলটপকা মন্তব্য করে দিয়ে তারপর তিনি আমার নিবন্ধটির বিপরীতে তাঁর আপত্তির কথা বলতে শুরু করেছেন এক এক করে, একেবারে সহজতম ভাবে। কোনো ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সহমতও ঘোষণা করেছেন, যথা–'বাংলাভাষার বানানে যে সমস্যা রয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে... বাংলা বানানের সমতাবিধান করা নিতান্তই প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে কলিম খান-এর সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই।' তারপর তাঁর সহজতম কথাগুলি ক্রমে সহজতর, সহজ, কম সহজ, তারপর কঠিন-কঠোর, এবং ক্রমে কঠোরতর হতে থেকেছে এবং মনে হল এবার বুঝি-বা তাঁর কঠিনতম আপত্তির কথাটি বলেই তিনি তাঁর নিবন্ধটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। কিন্তু না। তাঁর কঠিনতম কথাটি তিনি শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট করে না-বলেই তাঁর নিবন্ধটি শেষ করে দিলেন। যদিও, তাঁর সেই অস্পষ্ট কঠিনতম কথাটিই তাঁর সমস্ত আপত্তির পিছনে বারংবার উঁকিঝুঁকি মারল। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমার নিবন্ধটিতে তিনি এমন কিছুই পাননি, যার একটুখানি প্রশংসা করা যায়!

যাই হোক, আমি শুরু করব তাঁর সেই স্পষ্ট করে না-বলা কঠিনতম কথা দিয়েই এবং ক্রমে কঠিনতর, কঠিন, সহজ, সহজতর পেরিয়ে সহজতম-তে পৌঁছব এবং শেষ করব তাঁর আলটপকা মন্তব্য দুটির মুখোমুখি হয়ে। আশা করা যায়, এভাবেই তাঁর সঠিক আপত্তিগুলোকে (সেরকম কিছু থাকলে) সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে এবং ভুল আপত্তিগুলিকে খণ্ডন করা যাবে। তবে তার আগে, কোন পরিস্থিতিতে আজ আমরা এ-বিষয়ে কথাবার্তা বলছি, তার সমগ্র প্রেক্ষাপটটি দেখে-বুঝে নেওয়া জরুরি বলে মনে করি। প্রথমে সেকথা বলে নিয়ে আমি মান্যবর মঈন চৌধুরীর বক্তব্যের মুখোমুখি হব।

দুই.

বাংলাভাষার পঞ্চভুবন

আজ আমাদের বাংলাভাষা পঞ্চভুবনে পরিব্যাপ্ত–এক. পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের জগৎ, দুই. বাংলাদেশের বাঙালিদের জগৎ, তিন. উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিদের জগৎ, চার. ভারতের বাকি অংশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা যথেষ্ট-সংখ্যক বাঙালিদের জগৎ, ও পাঁচ. পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রবাসী বাঙালিদের জগৎ। সব মিলিয়ে ২৪ কোটি বাঙালি বা বাংলাভাষী মানুষের পঞ্চভুবন। লক্ষণীয় যে, তৃতীয় ভুবন১ উত্তর-পূর্ব ভারত এখন ত্রিপুরাসহ সাতটি রাজ্যে বিভক্ত,

এবং অষ্টম রাজ্য হিসেবে সম্প্রতি বিহার থেকে পৃথক হয়ে ভারতের নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড (বাংলাভাষা যে-রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে) সেই দলে যোগ দিয়েছে। বাংলাভাষার যা-কিছু উত্তরাধিকার ও দক্ষিণাধিকার,২ তা-সবের স্বাভাবিক অধিকারী এই পঞ্চভুবন।

একথা অজানা নয় যে, বাংলাভাষার সমস্ত সম্পদ সকলের হাতে সমানভাবে নেই, কোনো ভুবনের হাতে রয়েছে বেশি, কারও-বা কম, কোনো বিশেষ সম্পদ একের হাতে রয়েছে, তো অন্য কোনো সম্পদ অন্যের হাতে রয়েছে, কোনো সম্পদ-বা সকলের কাছেই কমবেশি রয়েছে—একটি যৌথপরিবারের পাঁচ ভাই পৃথগন্ন হলে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি যেমন হয়, খানিকটা সেইরকম। তবে বাইরের কেউ যদি বাংলার বিষয়ে জানতে বুঝতে কথা বলতে চায়, সে অবশ্যই আমাদের এই পঞ্চভুবনের ভিতরে যার হাতে বাংলাভাষার পতাকাটি থাকে, প্রথমে তারই কাছে যায়, তার সাথেই কথা বলে। চর্যাপদ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাভাষার সূত্রপাত হলেও, বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় কৃত্তিবাস-কাশীরামের হাতে এবং বঙ্গদেশে পাঠান রাজাদের ছত্রছায়ায়। আর, মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেই হাতে উঠে আসে পতাকা। সর্বাগ্রে সেই পতাকা আমরা দেখতে পাই গৌড়বঙ্গের হাতে, তার পরে তা কাটোয়া-নবদ্বীপ-ঢাকা-বিক্রমপুর এরকম নানাস্থানে ইতস্তত পায়চারি করে একসময় চলে যায় ত্রিপুরায়। ১৮৮০ সালের কিছু আগে-পরে সেই পতাকা চলে আসে কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গদেশে, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পরেও পতাকাটি পশ্চিমবঙ্গের হাতেই ছিল এবং এখনও রয়েছে বটে, কিন্তু ১৯৭১-এ বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর এবং পরবর্তীকালে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা-দিবস রূপে ঘোষণা করে দিয়ে বাংলাদেশ যেন-বা প্রথম ভুবনে উঠে এসে সেই পতাকা কাঁধে তুলে নেওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। হয়তো সেজন্যেই বাংলাভাষা সম্পর্কে কিছু জানতে বুঝতে হলে ইয়োরোপ-আমেরিকা আজকাল ঢাকায় ফোন করে।

অদূর ভবিষ্যতে হয়তো-বা বাংলাদেশই আমাদের পঞ্চভুবনের, পাঁচ ভাইয়ের মিছিলের সামনে বাংলাভাষার পতাকাটি হাতে নিয়ে চলবে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বাংলাভাষাচর্চার বর্তমান দুরবস্থা, অন্য ভুবনগুলির ওপর আমাদের অযোগ্য অ্যাকাডেমিশিয়ান ও কবি-সাহিত্যিকদের 'দাদাগিরি' এবং বাংলাদেশে সেই চর্চার তুলনামূলক অগ্রগতি, অর্জনের ও যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা থেকেও সেরকম ইঙ্গিত মেলে। তবে, যতদূর বুঝতে পারি, এখনও বাংলাভাষার পতাকাটি, হেলে-পড়া সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্লান্ত-অবসন্ন কাঁধেই বাহিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমশ স্থানবদল পতাকার হাতবদল করার একটা অঘোষিত প্রক্রিয়া চললেও, মনে হয়, হাতবদলের সে-প্রক্রিয়াটি এখনও শেষ হয়নি। হয়তো বাংলাভাষার মহিমার পূর্ণ অধিকারী সে এখনও হতে পারেনি, হতে পারলে দেখা যাবে বাংলাদেশই 'বাংলাভাষা-সংসার'-এর কর্তা হয়ে গেছে; বাংলাভাষার পতাকাটি তার কাঁধেই শোভা পাচ্ছে।

কিন্তু সংসারের কর্তা হলে বা পতাকার অধিকারী হলেই হয় না, অনেক কর্তব্যের দায় এসে পড়ে। আমরা কেবল বর্তমান বা কেবল ভবিষ্যৎ ভেবেই চলি না, এমনকি 'ভবিষ্যৎ-বর্তমান-ভূত'—এভাবে ভেবেও চলি না। 'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান' ভেবে চলা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সবার আগে অতীতের অভিজ্ঞতা, তারপর তদনুসার সম্ভাব্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং তার পরে বর্তমানে কী করব না-করব তার সিদ্ধান্ত-গ্রহণ। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রথম দায় পরম্পরাগত (পৈতৃক) সম্পদের উত্তরাধিকার বহন করার দায়, সেই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ,

পালন, পরিপোষণ, এবং ভবিষ্যতের ফসল ফলানোর পরিবেশরক্ষার দায়। তার ওপর রয়েছে অন্য ভুবনগুলির প্রতি (ভাইদের প্রতি) কর্তব্য। সর্বোপরি পতাকার (বা বাংলাভাষার) মর্যাদা ও মহিমারক্ষার দায়। এই দায়গুলি পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা-উত্তরকালে যথাযথভাবে পালন করেনি বলেই হয়তো পতাকার হাতবদল ঘটছে। এখন বাংলাদেশ যদি সে-কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে উঠতে না পারে, কাল আমরা দেখব সেই পতাকা চলে গেছে তৃতীয় বা চতুর্থ ভুবনের হাতে, কিংবা পতাকাটি লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে; দুনিয়াতে বাংলাভাষার কোনো মর্যাদাই আর নেই। ইতিহাসের নিয়মের তো অন্যথা হতে পারবে না।

এর ওপর রয়েছে ভাইয়েদের ভিতরে সমমর্যাদার সম্পর্ক, পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্পর্ক। সে-সম্পর্ক যেদিন প্রতিষ্ঠা করা যাবে, সেদিন পঞ্চভুবনের পাঁচ ভাইয়ের প্রত্যেকেই বাকি চার ভাইয়েরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে ভেতর থেকে যে-ই বেরিয়ে আসবে, দেখা যাবে তারই কাঁধে রয়েছে বাংলাভাষার পতাকা। মনে হয়, সেদিনের এখনও অনেক দেরি। তবে, আমাদের চলার গতিমুখ সেদিকেই থাকা উচিত।

আমি মনে করি, বাংলাভাষার ব্যাকরণ শব্দার্থতত্ত্ব ইত্যাদি মূল নীতির বিষয়ে কথা বলতে গেলে বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের এই সমগ্র প্রেক্ষাপটটি মনে রেখে কথা বলা দরকার।

তিন.

যেকথা তুমি বলিতে চাও, সেকথা তুমি বল না

এবার আমাকে মান্যবর মঈন চৌধুরীর 'প্রতিক্রিয়া'র মুখোমুখি হতে হবে। তিনি লিখেছেন, "সবশেষে একটা কথা বলি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস', এই বাক্যের সাথে আমি একমত নই।" এটি তাঁর শেষ কঠিনতম কথার ঠিক আগের কথা। এর পরই তিনি তাঁর না-বলা কঠিনতম কথাটি অস্পষ্টভাবে বলে দিয়ে তাঁর নিবন্ধটি শেষ করেছেন; সেই কথাগুলি এরকম–"বাংলাভাষী বঙ্গাল মুসলমানদের ঐতিহ্য-ইতিহাসও মক্কা-মদিনায় নয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সব বাংলাভাষী জনগণের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙ্গারিডী, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে। আমাদের শেকড় খুঁজতে ভাষা ও সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ আরও জোরে চালাতে হবে বৈকি।"

না, মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাদের 'বেজন্মা'৩ ভাবেননি। তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের বাপ-পিতামহ ছিল, পিতৃমাতৃপরিচয় ছিল, আমরা একেবারে অনাথ নই; তাই তিনি বলেছেন–আমাদেরও 'ঐতিহ্য-ইতিহাস' এবং 'প্রকৃত ইতিহাস' রয়েছে। কিন্তু কোথায় রয়েছে? তিনি সাহস করে বলেছেন যে, 'মক্কা-মদিনায়' নেই। ভালো কথা। তা হলে কোথায় রয়েছে? (না, পরম্পরাগতভাবে প্রবহমান আমাদের লিখিত প্রাচীন সাহিত্যের শত শত প্রাচীন গ্রন্থসম্ভারেও নেই, অর্থাৎ বেদ উপনিষদ সাংখ্য মীমাংসা বেদান্ত যোগ তন্ত্র পুরাণ সংহিতা রামায়ণ মহাভারত যাস্ক পাণিনি ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস কাশীরাম কৃত্তিবাস কিংবা বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রসমূহে, কৌটিল্যে, চরক-শুশ্রুতে অথবা আমাদের বহুকালক্রমাগত শাস্ত্রীয় নৃত্য বাদ্য সংগীত আচার অনুষ্ঠান ... ইত্যাদি ইত্যাদিতে নেই, এই 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার' ফেলে দিতে হবে–এটিই

তাঁর না-বলা অস্পষ্ট কথা। তিনি বলেছেন, সে-ইতিহাস–) রয়েছে 'বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে।' কীভাবে রয়েছে? মাটিচাপা পড়ে? না, জনপদগুলোর মাটি খুঁড়ে ফেলতেও তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের শেকড় খুঁজতে ভাষা ও সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ আরও জোরে চালাতে হবে...।' কিন্তু ভাষার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ, সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ কীরকম কাজ? সে-কাজ কেউ কি করেছেন? কীভাবে করতে হয়? না, এসব বিষয়েও তিনি আমাদের কিছুই বলেননি। তা হলে তিনি কী বলতে চান?

যা বলতে চান, সেটি মান্যবর মঈন চৌধুরীর মতো অস্পষ্টভাবে নয়, একেবারে খোলা মনে বলেছিলেন কলকাতার এক পাঠক।৪ তাঁর বক্তব্য ছিল–"আমরা যারা সিডিউল্ড্ কাস্ট, ওবিসি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, শূদ্র, আমরা অত সহজে প্রাচীন ভারতের লিখিত সাহিত্যের উত্তরাধিকার মেনে নিতে পারি না। যতদূর জানি, আপনাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও মানেন না। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলির উত্তরাধিকার স্বীকার করতে আমাদের বাধে। ..."

হ্যাঁ, মান্যবর মঈন চৌধুরীর মনের কথাটিও এই-ই। 'বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলো'র ইতিহাস রয়েছে এবং এখানেই রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু এইসব জনপদের অধিবাসীদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময় থেকে পাঠান-মোগল যুগের আগে পর্যন্ত যে-সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, এবং তৎসংক্রান্ত যে-লিখিত গ্রন্থাদি রয়েছে, সেগুলির উত্তরাধিকার তিনি স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্পষ্ট করে সেকথা বলতেও চান না। কিংবা বলতে ভয় পান। ঐসব প্রাচীন গ্রন্থে ইতিহাস কতখানি আছে, আদৌ আছে কি না, সেটি বড়ো কথা নয়, এগুলির উত্তরাধিকার আমরা বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের অন্তর্ভুক্ত শূদ্র, বৌদ্ধ, জৈন, আদিবাসী ও মুসলমানরা স্বীকার করি কি না, তার দায় গ্রহণ করতে রাজি কি না, সেটিই সবচেয়ে কঠিনতম এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা। এবং এই কথাটি স্পষ্টাক্ষরে মান্যবর মঈন চৌধুরীকে আজ বলতে হবে। আজ সময় এসেছে, বাংলাদেশের মনীষা বলতে যাঁদের বোঝানো হয়ে থাকে, তাঁদেরকেও একথাটি আজ স্পষ্ট করে বলতে হবে, তাঁরা ঐ 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের' উত্তরাধিকার স্বীকার করতে ও তার দায় গ্রহণ করতে চান কি না। যতটা জানি, এক্ষেত্রে তাঁরা ইতস্তত করছেন, কেউ-কেউ বিরোধিতাও করছেন। কিন্তু ঐ উত্তরাধিকার স্বীকার ও তার দায় গ্রহণ না করলে বাংলাভাষার প্রথম ভুবনের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা তাঁরা কিছুতেই অর্জন করতে পারবেন না–একথা আমি আজ হলফ করে বলে দিতে পারি। এবং সম্ভবত এই সেই কারণ, যে-কারণে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরেও পতাকা হাতবদলের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে পারেনি।

ঠিকই। ওই গ্রন্থগুলিতে বিধৃত যে-জ্ঞানভাণ্ডার, তাকে আমি ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মানুষের পূর্বপুরুষের অর্জন বলে মনে করি। আমাদের প্রত্যেকের তাতে সমান অধিকার। এর পক্ষে অজস্র তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যার সাহায্যে একথা অনায়াসে প্রমাণ করা যায় যে, এখন যাঁরা সিডিউলড্ কাস্ট, ওবিসি, বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এক কথায় শূদ্র, মুসলমান, বৌদ্ধ, আদিবাসী, উপজাতি, শিখ, কবিরপন্থী ... তাঁদের পূর্বপুরুষরাও প্রাচীন ভারতের সেই জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজে সমান অংশীদার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের সকলের সমান অধিকার–একথাটি পরম সত্য। একা ব্রাহ্মণের তাতে সর্বাধিকার, তা নয়। তা ছাড়া হিন্দুধর্মের সূত্রপাত তো ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। কথাটি অনেকেই বলে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, বদরুদ্দিন উমর বলেছেন, আরও অনেকে বলে গেছেন। আমি যে-ইতিহাস উদ্ধার করেছি,৫ তাতেও সেকথা সপ্রমাণ সমর্থিত হয়। হিন্দু-ভারতের ইতিহাস তো

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ, এই ৭০০ বছর। ১৪৫০-এর পরের কথা সবাই জানে, কিন্তু ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের আগের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস কাদের ইতিহাস? ভারতের সমস্ত অর্জনকে একমাত্র 'হিন্দুদের ইতিহাস' বা 'ব্রাহ্মণদের ইতিহাস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়? এ তো দিনে ডাকাতি!

অশোকের কালেই (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এক্সপোর্টার। ভারত তো তখন হিন্দু নয়, বৌদ্ধ। তখন ভারতের চেয়ে সভ্যদেশ আর কে? আর তখন ভারতসমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন। ... আরও কথা আছে—অনাদিকাল থেকে শূদ্রও বেদপাঠ করত বলেই তো ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তার বেদপাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিংবা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের কথা ধরুন। তার উত্তরাধিকার কি আমাদের নেই? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, এঁরা কারা? কার উত্তরাধিকারী? তা ছাড়া আপনি ব্রহ্মদেশে বা ইন্দোনেশিয়াতে চলে যান-না, প্রত্যক্ষ বুঝে নেবেন মুসলমানরাও সেই প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী কি না। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে ব্রাহ্মণ্যবাদ আমাদের সেই উত্তরাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ব্রিটিশের ভারত আগমনের পর সে-অধিকার আমরা ফিরে পাই। এখন যদি আমরা স্বেচ্ছায় সেই উত্তরাধিকার বর্জন করি, ব্রাহ্মণ্যবাদের উদ্দেশ্য নিজে থেকেই সফল হয়ে যাবে। তাঁদেরকে আর ইনফর্মেশন হাইডিং করার কলঙ্ক নিতে হবে না, অথচ ইনফর্মেশন হাইডিং হয়ে যাবে। জ্ঞানরাজ্যে 'অ্যাকসেস' রুখে দেওয়াই তো মানুষের সর্বনাশ করার উপায়। বেদপাঠ নিষেধের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সেটা স্পষ্ট দেখেছিলেন, 'জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনিই শুকাইয়া যায়, শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল।' [কর্তার ইচ্ছায় কর্ম]।

যাই হোক, এসব চিন্তাকে আমার ভালো চিন্তা মনে হয় না—আমাদের পঞ্চভুবনের মুসলমানদের পিতৃ-পিতামহরা কি সব বিদেশ থেকে এসেছিলেন? আসেননি। তাঁরা সবাই এদেশেরই মানুষ। তাই, এদেশের যা-কিছু উত্তরাধিকার, তাতে আমাদের সকলের সমান অধিকার বলেই আমি মনে করি। তাকে আমি অস্বীকার করতে যাব কোন দুঃখে? আমি মেদিনীপুরের 'খেড়িয়া মুসলিম' সম্প্রদায়ে জন্মেছি। যাঁরা বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হয়েছিলেন, তাঁদের যেমন 'নেড়ে মুসলিম' বা 'নেড়িয়া মুসলিম' বলে, তেমনি যাঁরা মেদিনীপুরের আদিবাসী-সাঁওতাল (যে-সনাতন ভারতীয়রা৬ আদিম বৈদিক সমাজের সূত্রপাতেই যৌথসমাজের এলাকা থেকে জঙ্গলে পাহাড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন) থেকে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের 'খেড়ে মুসলিম' বা 'খেড়িয়া মুসলিম' বলে। আমার সেই আদিম পূর্বপুরুষেরা কি এদেশের অন্য সমস্ত বাসিন্দার পূর্বপুরুষের মতো এই ভূমির ও তার সংস্কৃতির সমান অংশীদার নন? লোকে কেন বলবে আমার সে-উত্তরাধিকার নেই? আমিই-বা কেন সেই সনাতন যুগ থেকে শুরু করে গতকাল পর্যন্ত আমার সেই 'সত্য-উত্তরাধিকার' অস্বীকার করতে চাইব? ইরান ইরাক তুরস্ক মিশরের মুসলিমরা তাঁদের প্রাক-ইস্লামিক ইতিহাসের জন্য গর্ববোধ করেন এবং তা সযত্নে রক্ষা করেন। তাঁদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইরানের ফিরদৌসির 'শাহ্‌নামা'র মতো অজস্র নিদর্শন তো রয়েছেই। আর আমরা? আমরা আমাদের 'প্রি-ইস্লামিক হেরিটেজ'-এর জন্য লজ্জা বোধ করি! আশ্চর্য!

হ্যাঁ, অনেক বাংলাভাষী মুসলমানই সেই উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে চান। সেটি তাঁদের চিন্তার গুরুতর ত্রুটি বলেই আমি মনে করি। বিশ্বাস না হলে, এই উপমহাদেশের যে-কোনো মুসলমানের সাত-আট পুরুষ পেছনে যান, গেলেই এমন পুরুষকে পাবেন যিনি তুলসীকে জল দিতেন। আমার পূর্বপুরুষ যদি মহাভারতে বর্ণিত ইতিহাসের কোনো চরিত্র না-ও হন, যে-সমাজের ইতিহাস মহাভারতে উপস্থাপিত হয়েছে, আমার পূর্বপুরুষ সেই সমাজের একজন সদস্য অবশ্যই ছিলেন। তিনি আকাশে বিচরণ করতেন না।

মান্যবর মঈন চৌধুরী বলতে পারেন–কিন্তু ওই গ্রন্থগুলিই তো এককালের ব্রাহ্মণের শোষণ-শাসনের হাতিয়ার ছিল। তার উত্তরাধিকার মানে কী বোঝায়? আমরা কি ওগুলো থেকে শিখে কাউকে শোষণ-শাসন করতে যাব, নাকি তাঁরা যে শোষণ-শাসন চালিয়েছিলেন সেটি ঠিক বলে মনে করব?

এর উত্তরে আমি বলব–ভাষা দর্শন বিজ্ঞান, এগুলি মূলত মানুষের জীবনযাত্রার সহযোগী কিছু প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া অধিক কিছু নয়। মানুষ যুগে-যুগে এগুলি আবিষ্কার করেছে, এর বিকাশসাধন করেছে। যেমন শূন্যের আবিষ্কার, যেমন কোদাল-কাঁচি, যেমন নুন আবিষ্কার, যেমন আগুন আবিষ্কার। এগুলো যন্ত্রের মতো। এগুলির নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে-ব্যক্তি এগুলিকে ব্যবহার করে, তারই উদ্দেশ্য থাকে। তো, আমাদের পূর্বপুরুষের আবিষ্কার-করা ঐ জ্ঞানসম্পদ আমরা ফেলে দিতে যাব কোন দুঃখে? ব্রাহ্মণরা সেই জ্ঞানভাণ্ডারকে আমাদের শোষণ-শাসনের জন্য ব্যবহার করেছিল বলে? তা হলে তো বিদ্যুৎ-প্রযুক্তি, বাষ্প-প্রযুক্তি, এসবও ফেলে দিতে হয়। ইংরেজি ভাষাটাও ফেলে দিতে হয়। কারণ, ইংরেজ তো ওগুলোকে আমাদের শোষণ-শাসন করার জন্য ব্যবহার করেছিল। আমাদের বরং উচিত সেই জ্ঞানগুলি আত্মস্থ করা, অন্যকে ঠকানোর জন্য নয়, নিজেদের উন্নয়নের জন্য সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করা। আর, আমি যতটুকু দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষের ঐসকল সম্পদ সত্যিই আমাদের বর্তমান উন্নয়নেও বিপুল সহায়তা করবে।[৭]

চার.

হারালে চায় পেলে নেয় না ভব জীবের ভ্রান্ত যায় না[৮]

মান্যবর মঈন চৌধুরী তাঁর শেষ কঠিনতর কথাটিতে বলেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস', এই বাক্যের সাথে আমি একমত নই।" কিন্তু কেন, তার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা তিনি দেননি। পরিবর্তে, প্রকৃত ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের তার দিগ্‌দর্শন দিয়েছেন–'বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে।' ঐ জনপদগুলোতে কোনো ইতিহাসই পাওয়া যাবে না, তা আমি বলছি না। কিছু-কিছু পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু চাষ করে ফসল ঘরে তোলার মূল উৎপাদন কর্মযজ্ঞটাই বাদ দিয়ে 'উঞ্ছশিল' ('ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি একটি একটি করিয়া গ্রহণ ও ধান্যাদির মঞ্জরী সংগ্রহ'–বঙ্গীয় শব্দকোষ) বৃত্তি গ্রহণ করার তো কোনো মানে হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে ইতিহাস সংকলনের উঞ্ছবৃত্তিতেই মান্যবর মঈন চৌধুরীর যত আগ্রহ।

লোকে কখন উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করে? যখন কেউ তার মূল উৎপাদনকর্ম কেড়ে নেয়, তাকে অনধিকারী করে দেয়; অথবা তার স্বভাবটাই খারাপ, সে খেটে খেতে চায় না; তখন।

ব্রাহ্মণ্যবাদ এককালে আমাদের অনধিকারী করে দিয়েছিল। দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আমাদের সেই অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। মান্যবর মঈন চৌধুরী কিন্তু এখনও সেই অনধিকারকেই চরম সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে আছেন। তিনি মনে করেন–ঐ গ্রন্থগুলি হিন্দুদের ইতিহাস, ব্রাহ্মণদের ইতিহাস। এই বিশ্বাস মনের গভীরে থাকার জন্যই তিনি সর্বদা বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদিকে এড়িয়ে চলেন। সেই কারণে ইতিহাস সংকলনের মূল কাজের দিকে না গিয়ে তিনি ইতিহাস সংকলনের উঞ্ছবৃত্তির দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁর সমগ্র 'প্রতিক্রিয়া'র মূলে রয়েছে এই প্রবণতা, এবং তা বারংবার তাঁর বিভিন্ন বিরোধিতামূলক বাক্যের পিছনে উঁকিঝুঁকি মারছে। সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে 'কবিগুরু' হিসাবে সম্মান দিয়েও তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক উপদেশটিকে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এবং সেই প্রবণতার কারণেই৯ সংস্কৃত ভাষা দেখলেই তিনি দু-পা পিছিয়ে আসেন এবং আমাদের পরামর্শ দেন–'(বাংলা বানানের) এই সমতাবিধান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের প্রসঙ্গ টানা যাবে না।' আর, ঠিক এটাই ব্রাহ্মণ্যবাদের কাম্য ছিল! আমরা যেন সংস্কৃত থেকে দূরে থাকি, বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি না পড়ি, আমরা যেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার না পাই, আমরা যেন স্মৃতিহীন বা ইতিহাসহীন হয়ে যাই। মান্যবর মঈন চৌধুরী নিজের অজান্তে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের সেবাই করছেন। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস!

তবে এ-বিষয়ে আরও কিছু কথা আছে। রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস না-বলা কোনো নতুন কথা নয়। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এগুলিকে ইতিহাস বলে মনে করেন না। ইংরেজির কাছে আধুনিকতা ও আলোকপ্রাপ্তির শিক্ষালাভ করে যাঁরা আমাদের দেশে আধুনিকতার চর্চা শুরু করেন এবং নিজেদের দেশের অতীত ইতিহাস জানার ও বোঝার চেষ্টা করেন, তাঁরা কেউই ওগুলিকে ইতিহাস বলেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ।

প্রথমে ঐতিহাসিকদের কথা হোক। এরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে, যাঁরা রামায়ণ মহাভারতকে ইতিহাস বললেন না, আমাদের সেই দেশীয় ঐতিহাসিকরা কি সবাই খারাপ লোক? সবাই ইংরেজের পোঁ-ধরা? এরকম ভাবা একেবারেই ঠিক নয়। তাঁরা অনেকেই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও যথার্থ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তা হলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতো কথা না-বলে, ইংরেজের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে ওই গ্রন্থগুলিকে 'মিথ', 'মিথোলজি', 'রূপকথা', এরকম বলতে গেলেন কেন?

আমি যতটুকু বুঝেছি, ওরকম কথা না-বলে তাঁদের উপায় ছিল না। রামায়ণকে ইতিহাস বলে দিলেই তো হল না, ব্যাখ্যা করতে হবে, মানে বুঝিয়ে দিতে হবে। হনুমান মানে যদি monkey হয়, সূর্য মানে যদি sun হয়, পর্বত মানে যদি mountain হয়, তা হলে 'নিজের বগলে সূর্যকে টিপে ধরে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করে নিয়ে আসছে, কারণ সে বিশল্যকরণী চেনে না'–এসব কথা ইতিহাসের বইতে লিখতে গেলে যুক্তির মাথায় বাড়ি মারতে হয়। তা তাঁরা করেননি। যদিও ভারতীয়দের জীবনে প্রচলিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, গ্রন্থ দুটিতে বিধৃত কাহিনীসমূহের সঙ্গে ইতিহাসের কোথাও-না-কোথাও কিছু-না-কিছু সম্পর্ক রয়েছে। হনুমানের পূজা, মানুষের নামের পদবিতে ব্যাস, বাল্মীকি, রাম–এসব তো রয়েছেই। কিন্তু তার সাথে রামায়ণের কাহিনীর সম্পর্ক কী, তার ভিতর ইতিহাসটা ঠিক কীভাবে রয়েছে–সেকথা কেউই বুঝে উঠতে পারেননি। কারণ ঐ প্রাচীন

গ্রন্থগুলি পাঠ করার কৌশলটি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তো, তাঁরা কী করবেন? যাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, তাকে ইতিহাস বলে প্রমাণ করার চেষ্টা তাঁরা করেননি। এবং তাঁরা ঠিক কাজই করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে ইতিহাস বলেছিলেন কেন? কারণ, তাঁর অন্তত দুটো সুবিধা ছিল। এক. তাঁর ছিল উপনিষদের পাঠ ও ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে ওঠা, আর ছিল প্রবল অনুভূতিপ্রবণতা, যার জোরে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত অনুভব করে নিতে পেরেছিলেন। তাই বলে সেই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি পৃষ্ঠার অর্থ কিন্তু তিনিও বুঝতে পারেননি। পারলে রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাসসম্মত অনুবাদ তিনিই করে দিয়ে যেতেন। আজ আমাদের হাতে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি এসে গেছে বলে, তার সাহায্যে সেই ইতিহাসকে বুঝে নিতে পেরেছি বলে, একথা আজ সহজে বলতে পারি যে–রবীন্দ্রনাথের অনুভব-শক্তি সত্যিই অতুলনীয় ছিল। তিনি রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করবার যথার্থ ভাষা না-জেনেই অনেক দূর পর্যন্ত অনুভব করে নিতে পেরেছিলেন। তার জোরেই তিনি ওইরকম কথা বলে যেতে পেরেছিলেন। দুই. তাঁকে ঐতিহাসিকদের মতো তত্ত্ব-তথ্য দিয়ে সত্য প্রমাণের পরীক্ষায় বসতে হয়নি। তাঁর মনে যা এসেছে, তা তিনি অনায়াসে বলে যেতে পেরেছিলেন। পরীক্ষায় বসতে হলে এসব কথা তিনি বলে যেতে পারতেন কি না সন্দেহ।

যাই হোক, আজ আমরা জানি, ওগুলি সত্যিই ইতিহাস। একথা কেবল মুখে বলছি, তা নয়, প্রমাণও করতে পারি।১০ কারণ আজ আমরা ওই গ্রন্থগুলি পড়বার ও মানে বুঝবার কৌশলটি পুনরুদ্ধার করে ফেলেছি। সেই কৌশলে সেগুলিকে পড়লে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মানেই বেরোয়। আজ সেইভাবে সেগুলিকে পড়ে নিয়ে যে-কেউ সেই ইতিহাসকে একালের ঐতিহাসিকদের ভাষায় বর্ণনা করে দিতে পারবেন। তা ছাড়া, সেগুলিতে অনেক দারুণ দারুণ তথ্যও রয়েছে, যা আজকের পৃথিবীর আজও জানা নেই। যেমন–মানুষের আদি যৌথ সমাজ কেমন ছিল, তা ভেঙে গেল কীভাবে, ভেঙে কী হল, মানুষের পৃথিবীতে প্রথম পণ্য উৎপাদিত হল কী করে, প্রথম বিনিময়ের সূত্রপাত হল কীভাবে, প্রথম হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা হল কেমন করে, প্রথম রাষ্ট্রের উৎপত্তি হল কী করে ... এইরকম অজস্র নতুন কথা। আর 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে যা-সব রয়েছে তা দেখে একদিকে যেমন হিন্দু-মৌলবাদী, মুসলিম-মৌলবাদী এমনকি নাস্তিকদেরও চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে, অপরদিকে তেমনি ধর্মপ্রাণ ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন, বলে উঠবেন–আরে! এই নিয়ামককেই তো এতদিন খুঁজছিলাম!১১

সত্যি বলতে কী, রবীন্দ্রনাথের সময় এই গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলা ছিল 'রিস্কি'। রবীন্দ্রনাথের বুকের পাটা ছিল বলে, তিনি তা বলে যেতে পেরেছিলেন। আজ সেকথা বলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কারণ, আমরা বলতেই পারি–হাতে নিন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি, তাই দিয়ে রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ পুরাণ ... পড়ে নিন। নিজেরাই দেখে নিন ওগুলি ইতিহাস কি ইতিহাস নয়। মান্যবর মঈন চৌধুরীকে বলি, আপনিও সেভাবে পড়ে নিয়ে দেখুন, রবীন্দ্রনাথের 'বাক্যের সঙ্গে একমত' আপনি হতে পারেন কি না।

পাঁচ.

আশিক-মাশুক যদি থাকে দুই স্থানে[১২]

দেশ পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'হরিণ' বললে আমাদের মনশ্চক্ষে হরিণের ছবি ভেসে ওঠে। আমি লিখেছিলাম যে, না, শুধু হরিণের ছবি ভেসে ওঠে না, একটি 'সক্রিয়' হরিণের ছবি ভেসে ওঠে, কারণ 'আমরা ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারীকে দেখি', এবং আমি লিখেছিলাম, 'প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উত্তরও তা-ই'। তারপর এন্ড্নোট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম, নিরুক্তকার যাস্ক একথাই বলেছেন, এমনকি বিজ্ঞানী ডেভিড বোহ্মও এর পক্ষে সায় দিয়েছেন। তাঁর কথার উদ্ধৃতিও দিয়েছিলাম।

মান্যবর মঈন চৌধুরী কোনো কারণ না দেখিয়েই বলেছেন আমাদের দুজনের কথাই ভুল। তাঁর মতে, "ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো অর্থ নেই, যদি-না তা একটি দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত হয়। যে-জন্মান্ধ... হরিণ দেখেনি বা হরিণ সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে কীভাবে বলবে হরিণ কী কী করে? ... আসলে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাদর্শন বলুন, আর সস্যুর, দেরিদা... প্রমুখের ভাষাদর্শনই বলুন, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই; দেশকালকে গ্রাহ্য করে, বাক্যগঠনের ওপর নির্ভর করে একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।[১৩] কলিম যে বললেন, শব্দ উচ্চারণ করলেই আমরা 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে দেখি, তা কোনো অবস্থাতেই ভাষাদর্শনের বিষয় নয়... আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে আমি শব্দের বিপরীতে 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে আনি...?"

আমার কথা ভুল কি না, সেকথায় আমি পরে আসছি। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভুল কথা বলেছেন—এমন কথা বলার সময় মান্যবর মঈন চৌধুরীর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল, তিনি কী বলছেন। প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব এ-বিষয়ে কী বলে, একবার ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এতকাল ধরে এত বড়ো বড়ো ভাষাতাত্ত্বিক যে বলে গেলেন শব্দ উচ্চারিত হলেই মনশ্চক্ষে তার ছবি ভেসে ওঠে, শব্দের সেই চিত্রগুণের সবটাই বাজে কথা? আমাদের সাধারণ জ্ঞান কী বলে? সুনীলবাবুর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই, পড়াশুনো নেই, যে তিনি ওরকম বাজে কথা লিখে দিলেন? মান্যবর মঈন চৌধুরীর জানা উচিত সুনীলবাবু কিন্তু একেবারেই বাজে কথা বলেননি। তিনি যা বলেছেন, প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারেই বলেছেন। তাঁর কথাকে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ষোলো আনা সমর্থন করে। 'শব্দের চিত্রগুণ'-এর সেই কথাটি এমনকি বাংলাদেশের অনতিখ্যাত মাসুদ খানও জানেন (যাঁর লেখা 'কবিতা : মানবজাতির মাতৃভাষা' নিবন্ধটি আবহমান-এর ৩য় সংখ্যাতেই বেরিয়েছে)। কিন্তু মান্যবর মঈন চৌধুরী জানেন না! আশ্চর্য!

তিনি অন্যত্র সাফাই গেয়ে রেখেছেন—'আমি ব্যক্তিগত জীবনের একজন মূর্খ প্রকৌশল-বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ব আমার জানার কথাও নয়...' ইত্যাদি। এ তো ভারি অদ্ভুত কথাবার্তা! যিনি প্রকৌশল-বিজ্ঞানী, তিনি মূর্খ হতে যাবেন কেন! এ যদি তাঁর বিনয়ের কথা হয়, তা হলেও প্রশ্ন থাকে—বিজ্ঞানীদের ভাষাতত্ত্ব জানার কথা নয়, এই বিধান তাঁকে কে দিয়েছে! আর, ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সত্যিই তিনি যদি কিছুই না-জেনে থাকেন, তা হলে তাঁর তো এ-আসরে গাইতে আসার কথাই নয়।

যাক গে। এবার বলি, আমি কেন সুনীলবাবুকে সামনে রেখে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিরোধিতা করতে গেলাম। করেছি এইজন্য, যে, আমি মনে করি প্রচলিত ভাষাবিজ্ঞানে দ্বিতীয় তত্ত্বটিও এবার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রথম তত্ত্বটির কথাই সুনীলবাবু বলেছেন। মান্যবর মঈন চৌধুরীও বলেছেন, তবে দশ-শতাংশেরও কম বুঝে। তাই তিনি বলেছেন–'ভাষা-প্রতীক বা শব্দের কোনো অর্থ নেই, যদি-না তা একটি দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত হয়।' এটি প্রচলিত ভাষাতত্ত্বেরই কথা, তবে উনি জলে ভেসে থাকা বরফের উপরটুকু বলেছেন, বাকিটা বলেননি। সম্ভবত বাকিটা নিয়ে তিনি ভাবেননি। সেখানে রয়েছে–শব্দের ভিতরে নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, মানে, 'অজ' শব্দটির ভিতরে ছাগল বসে নেই, সেটি রয়েছে বাংলাভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁদের পরম্পরায়, অভ্যাসে, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে, যে-কথাটা আমরা অভিধানে লিখে রেখেছি এভাবে–অজ=ছাগল=goat। এটি একটি ফিক্সড বা সুনির্দিষ্ট অর্থ। [আবহমান-এর এই ৩য় সংখ্যাতেই প্রকাশিত 'কবিতায় চিত্রকল্প' নিবন্ধে সরকার আমিন যাকে বলেছেন 'অভিধানগত অর্থ' (পৃষ্ঠা ২৭)।] কিন্তু 'অজ' শব্দটি ঠিক এরকম অর্থই সর্বদা বহন করে না, বাক্যে প্রযুক্ত হওয়ার পরই তার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় অর্থাৎ মান্যবর মঈন চৌধুরীর ভাষায় 'শব্দটি দ্যোতক সৃষ্টি করে দ্যোতিত হলেই' আমরা তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি। যেমন 'গৃহপালিত পশুদিগের ভিতর অজই সবচেয়ে নিরীহ' বাক্যে 'অজ' শব্দের মানে goat; আবার 'তুমি যে একেবারে অজ আম থেকে শুরু করলে হে!' বাক্যে 'অজ' শব্দের মানে very beginning। অর্থাৎ, শব্দের ভিতরে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু পরম্পরাগতভাবে তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা অভিধানে লিখে রাখা থাকে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই অর্থ কখনো কখনো কিছু-কিছু বদলে যায়–একালের ভাষাতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত। এটিকেই আমি বলছি প্রথম তত্ত্ব। একালের পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই শব্দের অর্থারোপ ও অর্থ নিষ্কাশনের এই নিয়ম। শব্দের এক্কেবারে কোনো অর্থই নেই, এটি বাজে কথা। শব্দের কোনো অর্থই যদি না থাকবে সব ভাষার অভিধানগুলো জ্বালিয়ে দিলেই হয়। তা ছাড়া আকাশ নদী হরিণ বললে কার কার কথা বলা হচ্ছে সেটা সবাই বুঝতে পারে। তা হলে 'শব্দের কোনো মানে নেই'–কথাটার কী মানে? হ্যাঁ, সুনির্দিষ্ট যে-মানেটা প্রচলিত, সেটি কখনো-সখনো বদলায়। কিন্তু সে-ও তো আর যা-খুশি মানে-বদল নয়। বাক্যের প্রয়োগের কৌশলে মানেটা বদলে যায়। যেমন 'অজ-আম থেকে শুরু করা' মানে 'একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা' এরকম প্রয়োগে 'অজ' শব্দটার মানে বদলে গেল। কিন্তু সেটি একেবারে কোনো নিয়ম মানেনি তা নয়। বিদ্যাসাগর যদি 'অজ' 'আম' দিয়ে তাঁর বর্ণপরিচয় শুরু না করতেন, অজ শব্দের এমন প্রয়োগ সম্ভব হত না। সুতরাং মানে-বদলেরও একটা নিয়ম রয়েছে। যা-খুশি হয় না। আপনি 'অজ' মানে 'সুন্দরী' ভাবতে পারেন, ঘরে বসে ভাবতে পারেন। কিন্তু জনসমাজে এসে সুন্দরীদের 'অজ' বললে লোকে আপনাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে।

আর দ্বিতীয় তত্ত্বটি হল–শব্দের ভিতরেই অর্থটি রয়েছে। 'অজ' শব্দটির ভিতরেই রয়েছে 'নেই জনন যাহাতে' এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ। 'অ' ও 'জ' বর্ণ দুটি এই অর্থটিকে ধরে রেখেছে। এসব কথা আমি আমার পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। এই পদ্ধতিটি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতির জীবন্ত উত্তরাধিকারী বাংলাভাষা। প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব প্রাচীন ভারতের এই পদ্ধতিটিকে পরিত্যাগ করেছিল। তাই আমি প্রস্তাব করেছি, প্রাচীন

ভারতের ওই পদ্ধতিটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আমরা বাংলাভাষীরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভাষায় সেই উত্তরাধিকার যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তাই প্রথম পদ্ধতিটির পাশাপাশি আমি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলেছি। স্বভাবতই প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব আমার বক্তব্যে সায় দেয় না, অন্তত এখনও দেয়নি। সেই বিচারে, যাঁরা প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব ভালোভাবে জানেন, তাঁরা বলতেই পারেন যে আমি ভুল বলেছি। তাঁদের সেকথা বলার অধিকার আছে।

মান্যবর মঈন চৌধুরী জন্মান্ধদের ওপর নির্ভর করে চক্ষুষ্মানদের দুনিয়ার ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণের কথা বলেছেন। এভাবে ভাবাটা ঠিক হয়নি। লোকে শ্রেষ্ঠকে আদর্শ করে, না নিকৃষ্টকে আদর্শ করে? প্রকৃতির অভিশাপেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, আমাদের যে-ভাইটি তুলনায় অক্ষম, নিকৃষ্ট, আমরা তাকে সমমর্যাদা দিতে পারি, বিজ্ঞানের নিয়ম তো তা দেবে না। কেউ কি তার পাড়ার জন্মান্ধ মানুষটিকে পাড়ার সমস্ত মানুষের 'পথপ্রদর্শক'রূপে নিয়োগ করে তার ওপর নির্ভর করে গোটা পাড়ার সব বাসিন্দাকে নিয়ে ভ্রমণে বেরোনোর কথা ভাবতে পারে! তা ছাড়া, মানুষের দুনিয়ায় জন্মান্ধদের অনুপাত কত? মনে হয় এক-দু শতাংশের বেশি হবে না। তাদের আদর্শ বাকি ৯৮-৯৯ শতাংশ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে সব মানুষকে জন্মান্ধ-সম জগদ্দর্শনের পরামর্শ দেওয়া কি যথার্থ?

মান্যবর মঈন চৌধুরী বলেছেন–"কলিম যে বললেন, শব্দ উচ্চারণ করলেই আমরা 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে দেখি, তা কোনো অবস্থাতেই ভাষাদর্শনের বিষয় নয়...আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে আমি শব্দের বিপরীতে 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে আনি ...?"–এসব কথা তিনি কেন যে লিখতে গেলেন, কে জানে! তিনি কি যাওয়া, খাওয়া, ধরা, মারা, এসব ক্রিয়াকে দেখতে পান? কেউ কি পায়? যে যাচ্ছে, সে না থাকলে 'যাওয়া'টা দেখা যাবে কেমন করে? খাদক নেই কিন্তু খাওয়া চলছে, এমন হয় নাকি? হয় যদি, সে তো অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডেই সম্ভব–যে হাসছিল সে নেই, কিন্তু তার হাসিটা দেখা যাচ্ছে!

এ-বিষয়ে কার্যত প্রথমেই আমাদের মনে হয় আমরা 'যাওয়া'কে দেখি না, যে যায় আমরা তাকেই দেখি। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়–না, যে যায়, শুধু তাকেই আমরা দেখি না, 'তাকে যেতে' দেখি। শুধুমাত্র 'যাওয়া' 'খাওয়া' 'করা' 'ধরা' এগুলো দেখা যায় না। গমনকারীকে বাদ দিয়ে আমরা গমন দেখতে পাই না। খাদককে বাদ দিয়ে খাওয়া দেখা অসম্ভব। গ্রাসকে গ্রাস ভাত থালা থেকে উঠে কোথায় জানি উবে যাচ্ছে–ইনভিজিবল ম্যান নিয়ে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তাতে তেমন অজস্র ক্রিয়া দেখা যায় বটে, এবং সেই ক্রিয়ার ক্রিয়াকারীকে দেখতে পাওয়া যায় না ঠিকই, বাস্তবে কিন্তু ওরকম হয় না। উলটোটাও হয় না। মেদিনীপুরের পটুয়াদের পট দেখুন–ক্রিয়াকারীদের অজস্র স্থিরচিত্র দেখতে পাবেন, কিন্তু একটিও ক্রিয়া দেখতে পাবেন না। ক্রিয়ার অভাবকে গানের বর্ণনা দিয়ে পটুয়ারা সেরে দেন। আর, মানুষের দুনিয়াটা পটুয়ার পটও নয়, ইনভিজিবল ম্যানদের সমাজও নয়। আমাদের আকাশ, নদী, হরিণ, আম, জাম, রাম, শ্যাম, গরু, ছাগল–এরা পটুয়াদের স্থিরচিত্র নয়, এবং করা, ধরা, খাওয়া, যাওয়া, এসব কোনো পারফর্মার ছাড়াই নিজে-নিজে ঘটে না। তার মানে, বাস্তবে ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে ক্রিয়াকারীর কিংবা ক্রিয়াকারীকে বাদ দিয়ে ক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে ক্রিয়াকারী ও ক্রিয়া কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। তাদের সম্পর্ক প্রকৃতি-পুরুষের, আশিক আর মাশুকের। একজনকে বাদ দিয়ে আর-একজনকে দেখা অসম্ভব। এটি একটি অদ্বৈত সত্তা, যাকে

বলে 'টু ইন ওয়ান'। পৃথিবীর প্রাচীনতম শব্দার্থকোষ যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর প্রতিপাদ্য এই। মান্যবর মঈন চৌধুরী এসব কথা বুঝবার স্তরে নেই বলেই মনে হয়।

কিন্তু যে-দর্শনের ওপর নির্ভর করে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তাতে প্রকৃতি-পুরুষ, আশিক-মাশুক দুজনই পরস্পরকে ছেড়ে থাকে। তাতে আকাশ নদী হরিণ আম জাম এসব হল ক্রিয়া থেকে বিযুক্ত আলাদা নিষ্ক্রিয় স্থির সত্তা। বাস্তব যদিও সেরকম নয়, মানুষের পণ্যবাহী১৪ সমাজ নিজের সুবিধার জন্য প্রকৃতি-পুরুষকে আলাদা, নিষ্ক্রিয়, স্থির ধরে নিয়ে সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় এরকম ভাষাদর্শন গড়ে নিয়েছে। এই ভাষাদর্শনের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে একালের আধুনিক ভাষা-প্রযুক্তি। তা দিয়েও ভাব-বিনিময়ের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। যায় বলেই আজকের দুনিয়ার ভাষাগুলি তাদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। স্বভাবতই এই ধরনের ভাষায় শব্দের বিপরীতে এক ক্রিয়াহীন ক্রিয়াকারীর ছবি মানুষের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেকথাই বলেছেন এবং আধুনিক ভাষাতত্ত্ব অনুসারে শতকরা একশো ভাগ ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই ভাষা-প্রযুক্তি কাজ চালাতে পারে না। আমি দেখেছি, আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাষা-প্রযুক্তি চলে না। আর, ডেভিড বোহ্‌ম দেখেছেন কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ভাষা-প্রযুক্তি কাজ চালাতে পারছে না। আর, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি ... গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি ... মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি' 'তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না।'১৫ সমগ্রভাবে দেখতে হলে, আম্র আর যা-যা করে, গাছ আর যা-যা করে, মানুষ আর যা-যা করে, সেগুলিও দেখতে হবে। অর্থাৎ ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই সবকিছুকে দেখতে হবে, তা হলেই আমরা জগৎকে 'সমগ্রভাবে দেখতে' ও বুঝতে পারব। অতঃপর আমি লক্ষ করি যে, প্রাচীন ভারতে একরকম ভাষা-প্রযুক্তি ছিল যা গড়ে উঠেছিল ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীর অদ্বৈত দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, যাতে প্রকৃতি-পুরুষ কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না, এবং তারা সক্রিয় ও চলমান। যে-শব্দসম্ভার এই দর্শনের অনুশাসন মেনে চলে, আমি তাদের নাম দিই 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ'। তাতে স্বভাবতই শব্দের বিপরীতে ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারীর ছবি মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, এবং তাতেই প্রকৃত বাস্তব প্রতিফলিত হয়। মান্যবর মঈন চৌধুরী বাস্তবকে যথার্থ বোধের ভেতর আনেন না, তাই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের দর্শনটিকেও বুঝতে পারেন না; আর সেজন্যেই শব্দের বিপরীতে ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারীকে কীভাবে আনবেন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ, সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই জন্মায়, পরে পণ্যবাহী সমাজে বড়ো হতে হতে সে 'কনডিশন্‌ড্' হয়, বিশেষ্যভিত্তিক খণ্ডবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে থাকে, এবং যে-পরিমাণে ঐ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে সেই পরিমাণে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ক্রিয়াভিত্তিক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিটি হারায়। অর্থাৎ পণ্যবাহী সমাজের চাপে খুব বেশি 'কনডিশন্‌ড্' হয়ে না-গেলে মানুষ স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দুনিয়া দেখে। পাঁচ বছরের একটি শিশুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, 'বিড়াল' বললে তার মনশ্চক্ষে যে-বিড়ালের ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি একটি সক্রিয় বিড়াল কি না। দেখবেন, শিশুটিও শব্দের বিপরীতে 'ক্রিয়ারত এক ক্রিয়াকারী'কে স্বভাবতই আনতে পারে।

যাই হোক, আমি উপরোক্ত ধরনের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের ওপর নির্ভরশীল ভাষার নাম স্বভাবতই দিই 'ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা'। আমি দেখেছি এরূপ ভাষার সাহায্যে উপরোক্ত দুটো

ক্ষেত্রের কাজ চালানো যায়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি তা প্রয়োগ করেও দেখেছি এবং সফল হয়েছি, যদিও কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখা সম্ভব হয়নি; কারণ সে-বিদ্যা আমার নেই। আমি আরও দেখেছি যে, বাংলাভাষাই একমাত্র ভাষা যাতে প্রথম প্রকারের ভাষাদর্শন তো এখন প্রচলিত রয়েছেই, এই দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাদর্শনের উত্তরাধিকারও রয়েছে, এবং হিন্দি মারাঠি ওড়িয়া প্রভৃতি অন্য অন্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় যথেষ্ট বেশি পরিমাণেই রয়েছে। দ্বিতীয় তত্ত্বটিকেও স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুলেছি সেকারণেই।

ছয়.

পণ্ডিতে যেখানে পা ফেলতে ভয় পায়...

"কলিম এক পর্যায়ে এসে লিখেছেন : 'পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় শব্দের বর্ণেরা (ধ্বনিরা) মানে ধারণ করে না। এটিই বিশ্বের সমস্ত ভাষার সঙ্গে আমাদের বাংলাভাষার মূল ও প্রধান পার্থক্য।' আচ্ছা, যদি ব্যাপারটা এই হয়, তবে কলিম আমাকে বলবেন কি, শ্রবণ, শ্রাবণ, প্লাবন, প্রাশন, লবণ–এই শব্দগুলোর মাঝে যে 'ন' ও 'ণ' আছে, তার উচ্চারণে পার্থক্য কী? ..."

এর উত্তরে আমি কী বলব? আমি বললাম–আমাদের বাংলাভাষার শব্দের ভিতরে যে-বর্ণেরা থাকে তারা শব্দটির মানে ধারণ করে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার শব্দের সেগুণ নেই। [প্রমাণসহ একথা বলেই তো আধুনিক ভাষাতত্ত্বচর্চার দুনিয়ায় আমি প্রাচ্যের (বাংলাভাষার) তরফে ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্তের পতাকা তুলে ধরেছি। ভাষাতত্ত্বচর্চার দুনিয়ায় এ অনেক বড়ো কথা এবং একথার বিরুদ্ধে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে যে বিশাল প্রতিরোধ আসে তা থেকে আমাদের প্রাচ্যের প্রাচীন সাহিত্য, অভিধান ও কোষগ্রন্থগুলিই আমাদের (রবি চক্রবর্তী, আমি ও কয়েকজন সাথির) মতো মুষ্ঠিমেয় ক্রিয়াভিত্তিক-ভাষাবাদীদের বাঁচায়।] আর, আমার একথা শুনে মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাকে জানতে চাইলেন–'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণের পার্থক্য কী?! কী উত্তর দেব তাঁকে? বড়োজোর বলতে পারি–চলে যান মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে। যে-কোনো শিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলুন। নিজের কানে শুনেই বুঝতে পারবেন 'ন' আর 'ণ'-এর উচ্চারণের পার্থক্য কী।

এরপর তিনি আবার নির্দেশ দিতে লেগেছেন–"আমাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি কোনো এক তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে বাংলাভাষার নব্য-ব্যাকরণ রচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে এই নব্য-ব্যাকরণের একটি অংশে অবশ্যই প্রাচীন বাংলাভাষার অনুশাসনমূলক (Prescriptive) বিধান থাকতে পারে, তবে বর্ণনামূলক (Descriptive) অংশটি হবে আমাদের বর্তমানের ভাষা উচ্চারণ ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।"

'... কোনো এক তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে বাংলাভাষার নব্য-ব্যাকরণ রচনা করা'র কথা কে বলতে পারেন? যিনি ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। মান্যবর মঈন চৌধুরীকে বুঝতে হবে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অমন 'তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে' মাত্র দুটি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে–একটি সংস্কৃতভাষা আর একটি গ্রিকভাষার প্রেক্ষিতে। আর যত ব্যাকরণ এ-পর্যন্ত রচিত হয়েছে, সবই ওই দুয়ের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-ক্ষেত্রজ-জারজ-দত্তক ইত্যাদি নানারকমের সন্তান-সন্ততি। ব্যাকরণ রচনার কাজটি যথেষ্ট কঠিন ও মনীষীসুলভ জ্ঞানী মানুষদের কাজ। আর, মান্যবর মঈন চৌধুরী এমনভাবে বলছেন, যেন দোকানে খাট-পালঙ্ক বানানোর অর্ডার দিচ্ছেন।

আমার নিবন্ধটি যিনি পড়েছেন তিনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, আমার নিবন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নতুন বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রস্তাবের প্রতি আমি আমার সমর্থন জানিয়েছি বটে, কিন্তু কীরকম ব্যাকরণ রচনা করতে হবে, কে কীভাবে তা করবেন–সে-বিষয়ে একটি কথাও বলিনি। কাজেই, মান্যবর মঈন চৌধুরী যে হঠাৎ ব্যাকরণ নিয়ে এসব বলতে লেগেছেন, তা আমার সমর্থনে বা বিরোধিতায় নয়; নিজের জ্ঞান জানানোর জন্য। নিবন্ধের শুরুতে তিনি যে বলেছিলেন তিনি নিজের 'জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য' বা 'নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্য'ই নিবন্ধটি লিখেছেন, সেকথা সত্যি নয়। তবে তিনি ভান করেছেন, এমন কথা ভাবতেও আমার ভালো লাগছে না। যাই হোক, বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষদের বা 'বাংলাদেশের মনীষা'কে আমি যতটুকু বুঝেছি, যতটুকু জানি, মান্যবর মঈন চৌধুরীর নিবন্ধে সে-মনীষার সাক্ষাৎ মেলে না। 'বাংলাদেশের মনীষা'র প্রতিক্রিয়া কেন আমি পেলাম না, এ-দুঃখ আমার থেকেই গেল। এবং অভিমানও।

সাত.

না-ঘরকা না-ঘাটকা

"কলিম বলেছেন ... 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাভাষা কার্যত দুটো ভাগ হয়ে গেছে–বিশেষ্যভিত্তিক (লোগোসেন্ট্রিক) বাংলাভাষা ও ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) বাংলাভাষা।' মন্ত ব্যগুলো করে কলিম ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা নিয়ে প্রচুর বাগবিস্তার করেছেন, কিন্তু যা বলেছেন তার সাথে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কিংবা প্রাচীন বাংলাভাষার ভাষাতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।" একথা লেখার পর মান্যবর মঈন চৌধুরী দেশি বিদেশি বহু পণ্ডিতের নাম,অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁদের কারও-কারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে কি বিশেষ্যভিত্তিক কি ক্রিয়াভিত্তিক কোনো বিষয়েরই কোনো তত্ত্ব বা তথ্যের প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন হয় না এবং সবশেষে বলেছেন, 'ভুলভাবে জ্ঞান আহরণ করলে তা দিয়ে বস্তুসম্পর্কীয় সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় না।' অর্থাৎ আমি সঠিক জ্ঞান লাভ করিনি, আর সেজন্যেই আমার 'ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে' তাঁর 'আর কিছু বলার নেই।'

ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে–পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং। তাতে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানীরা কে কে ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক ভাষা বিষয়ে কী কী বলেছেন, তার বিস্তারিত ও ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছেড়ে ছেড়ে পাঁচ-সাতটি অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না-করে নিজের বিদ্যে জাহির করা হয়নি, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিণতি পরপর বিন্যস্ত করে আদি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা কেমন করে ক্রমে ক্রমে বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় পরিণত হল, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে সেই গ্রন্থটির সব কথা পুনরায় লেখা যাবে না। মান্যবর মঈন চৌধুরীকে সেটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে হবে। যতদূর জানি, ঢাকায় বইয়ের দোকানে ঐ গ্রন্থ পাওয়া যায়।

তবে অন্য পাঠকদের জন্য এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। আমাদের প্রিয় বাংলাভাষা অতীতের (ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবের) হাত থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক (বিশেষ্যভিত্তিক ভাষায় পরিণত) হতে গিয়ে দুদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছেও। অতীতকে

পুরোটা ধরে রাখতে পারেনি, ভবিষ্যৎকেও প্রয়োজনমতো অর্জন করতে পারেনি। তাই আজ আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে পড়তে পারি না, আবার ইংরেজির মতো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা করবার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণ শব্দও বাংলাভাষায় খুঁজে পাই না। এর ফলে আমাদের প্রিয় বাংলাভাষা দিনে দিনে 'না-ঘরকা না-ঘাটকা' হতে চলেছে। এই সমস্যা কতখানি গভীর, নীচের উদাহরণ থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে।

সহজ একটি ইংরেজি কথা ধরুন–The sun rises in the east। এই কথাটির বাংলা অনুবাদ আমরা অনায়াসে করে ফেলি 'সূর্য পূর্বদিকে ওঠে'। একইভাবে বাংলা থেকে ইংরেজিও করা হয়। এতে আমাদের কাজ চলে যায়। কিন্তু একটু আঁচালে দেখা যায় এই অনুবাদটি মোটেই সঠিক অনুবাদ নয়। কারণ sun বলতে ইংরেজিভাষী যাকে বোঝায়, আমাদের 'সূর্য্য' ঠিক তাকে বোঝায় না। তপন, আদিত্য, রবি, মরীচিমালী, ভাস্কর, মার্ত্তণ্ড, সবিতা, অর্ক, কিরণমালী, অংশুমালী, দিবাকর, দিনকর, দিননাথ, দিনমণি, দিনেশ, দিনেশ্বর, দিবেশ, দিনরাজ, বিবস্বান–সূর্য্যের সমজাতীয় এতগুলি শব্দের একটিরও যথার্থ ইংরেজি প্রতিশব্দ sun নয়। ('তপন' মানে তো 'তাপ দেয় যে'। বাকি শব্দগুলির অর্থও এরকম।) আবার পূর্ব (পূর্ব্ব) কেবলমাত্র east-কেই বোঝায় না, অতীতকেও বোঝায়, প্রাচ্যদেশকেও বোঝায়, বোঝায় যেকোনো previous-কেও। এর মানে ইংরেজি ভাষার শব্দগুলি যেরকম সুনির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) স্বভাবের, আমাদের বাংলাভাষার শব্দগুলি সেরকম নয়। তো, আমরা কী করলাম, সূর্য্যের সমজাতীয় ঐ ২০টি শব্দকেই ফেলে দিয়ে একটিমাত্র শব্দ তৈরি করে নিলাম–য-ফলা বাদে সূর্য, এবং একে sun শব্দের প্রতিশব্দ করে নিলাম। বাংলাভাষার হাজার হাজার শব্দের ক্ষেত্রে এরকম করে ফেললাম আমরা।

এরকম করে ফেলায়, যাহোক করে কাজ চালানোর উপায় পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল। বাংলাভাষার বিপুল সম্পদ বর্জন করে আমরা 'না-ঘরকা' হয়ে গেলাম, বিপরীতে ইংরেজির মতো যত প্রয়োজন তত স্পেসিফিক শব্দ বানাতে না পেরে 'না-ঘাটকা' হয়ে গেলাম। ব্রিটিশ আগমনের পর থেকে আমাদের এই দুরবস্থা। এরপর বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এসে আমাদের 'না-ঘাটকা' দুরবস্থা থেকে যতটা টেনে তোলার চেষ্টা করেন, 'না-ঘরকা' দুরবস্থা আমাদের তত বাড়তে থাকে। তা দেখে তাঁরা চেষ্টা করেন, আমাদের 'না-ঘরকা' দুরবস্থা যেন আর না বাড়ে। এখন আবার, সম্প্রতিকালের বানানসংস্কারকেরা আমাদের এই 'না-ঘাটকা' দুরবস্থা থেকে এতটাই টেনে তোলার চিন্তা করছেন যে, আমাদের ঘরটাই যেন আর না থাকে।

আমার আপত্তি ছিল সেখানেই। কারণ, আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে আমাদের ঘর ও ঘাট দুটোই লাগবে। সেকারণেই আমি বানানসংস্কারের যে মূলনীতির প্রস্তাব রেখেছিলাম, তাতে ঘর ও ঘাট উভয়ের সংরক্ষণের ও বিকাশসাধনের কথা ছিল। মান্যবর মঈন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া পড়ে মনে হল, আমার সে-প্রস্তাব মাঠে মারা গেছে। তিনি ঘরের পক্ষে তো নয়ই, ঘাটের পক্ষে কি না, তাও বোঝা গেল না–না ঘরকা, না ঘাটকা।

আট.

পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল[১৬]

মান্যবর মঈন চৌধুরী এর পর তিনটি আপত্তি তুলেছেন। প্রথম, সংস্কৃত 'স্থবির ও গতিহীন' ও 'শিষ্ট সমাজের ভাষা' ছিল এবং সেকথা আমার জানা উচিত ছিল। দ্বিতীয়, বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে, একথাটি ঠিক নয়। এবং সংস্কৃতভাষা ও বাংলাভাষার মধ্যে শাশুড়ি-বউমার সম্পর্ক নেই।

সংস্কৃত যে শিষ্টসমাজের ভাষা ছিল সেটা নতুন কথা নয়, প্রাচ্যের ভাষা নিয়ে যাঁরাই চর্চা করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই সেকথা জানেন। কিন্তু যেটা অনেকেই জানেন না, তা হল, কখন এটি বানানো হয়েছিল, কীভাবে বানানো হয়েছিল, কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে কারা বানিয়েছিল। একথা অবশ্য কেউ-কেউ জানেন যে, সেকালের প্রচলিত একাধিক ভাষা ও উপভাষাকে 'সংস্কার করে' সেকালের পণ্ডিতেরা এই ভাষা বানিয়েছিলেন বলেই এর নাম 'সংস্কৃত' ভাষা। কিন্তু মান্যবর মঈন চৌধুরী তো ভাষাটিকে একজন ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখছেন না। দেখছেন এমন একজন মুসলমান হিসেবে, যিনি বিশ্বাস করেন সংস্কৃত হল হিন্দুদের ভাষা, ব্রাহ্মণদের ভাষা। সুতরাং ভাষাটিকে 'শিষ্ট সমাজের ভাষা' বলে দেগে দিয়ে তার থেকে নিজেকে এবং অন্য পাঠকদেরকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। এই সেই 'প্রবণতা' যার কথা আমি শুরুতেই বলেছি। এ-প্রবণতা তাঁর মনের গভীরে অত্যন্ত সক্রিয়। আর সেকারণেই তাঁর এত সংস্কৃত-বিরাগ। এবং সেজন্যেই তাঁর 'Give the dog a bad name and kill him' নীতি গ্রহণ। সেই 'প্রবণতা'র কারণেই তিনি হুকুম ঝাড়েন–'কিন্তু এই সমতাবিধান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কিংবা তৎসম শব্দের প্রসঙ্গ টানা যাবে না।' তার জন্য 'ঐতিহ্যনির্ভর বাংলা বানানকেই গ্রহণ করা উচিত, ভাষার ঐতিহ্যের সাথে সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধ-তৎসম ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে আনা অর্থহীন।' তাজ্জব কথাবার্তা! ইনি কি 'ঐতিহ্য' শব্দের 'পরম্পরাগত', 'traditional' মানেটাকে মানেন না? তা যদি জানেন এবং মানেন, তা হলে তো তাঁর লেখার কথা ছিল '... ভাষার ঐতিহ্যের সাথে সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধ-তৎসম ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে আনাই যুক্তিযুক্ত।' তিনি তো উলটো লিখেছেন। তা হলে কি মান্যবর মঈন চৌধুরী 'ঐতিহ্য' শব্দের অন্য অর্থ জানেন? কী সেই অর্থ?

দ্বিতীয় কথা হল বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে কি না। একথা শুনলেই মান্যবর মঈন চৌধুরী চটে যান। এ যেন 'গৌড়াগত বাঙালি' 'যবন-পণ্ডিতের গুরু-মারা' চেলাকে পিতৃনাম জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। খবরদার, সংস্কৃতের নাম করবে না, 'সংস্কৃত আমাদের ভাষার নিকট-আত্মীয় নয়, বরং প্রাকৃত হল বাংলাভাষার খুবই নিকট কুটুম।' তা, পিতৃনামটা তবে কী? না, তা তিনি বলবেন না, তিনি বড়োজোর বলতে পারেন, 'বাংলাভাষা কোন ভাষা থেকে এল তা নিয়ে এখনও পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।' এই বলে তিনি আমাদের বাংলাভাষার পিতৃপুরুষ বিষয়ে গ্রিয়ারসন সুনীতিকুমার থেকে শুরু করে একেবারে জ্যোতিভূষণ চাকী পর্যন্ত পণ্ডিতজনেরা যা যা বলেছেন, তার বিশাল তালিকা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে আসেনি; এসেছে 'প্রাকৃত অপভ্রংশ' থেকে, সেটি আবার এসেছে 'প্রাচীন প্রাকৃত' থেকে, সে নাকি আবার 'আদিম প্রাকৃত' থেকে এসেছে এবং সেই আদিম প্রাকৃত এসেছে 'সংস্কৃত (অপরিবর্তনীয়)' নামের একটি ভাষা থেকে! আর এই শেষ দুই ভাষা 'আদিম প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত

(অপরিবর্তনীয়)' নাকি 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' ভাষা। এই হল তাঁর বাংলাভাষার বংশলতিকা-বিষয়ক বিদ্যা।

যাই হোক, যদিও এখন আমি জানি 'বহিরাগত প্রাচীন ভারতীয় আর্য' তত্ত্বটাই সম্পূর্ণ ভুল তত্ত্ব এবং একেবারেই বাজে ও আমাদের অজস্র বিভ্রান্তির মূল, তবুও অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এখন আমি সেসব নিয়ে কিছু বলব না। সংস্কৃতভাষা 'স্থবির ও গতিহীন' ভাষা কি না এবং তা থেকে কোনো নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে কি না, বাংলাভাষা সেই সংস্কৃত থেকে জন্মেছে, নাকি প্রাকৃত থেকে জন্মেছে, সে-প্রসঙ্গে আমার যা বলার এখন সেকথাই বলব।

বাংলাভাষা কোন ভাষা থেকে ঠিক কোন কোন পথ বেয়ে আত্মস্বরূপ লাভ করেছে, তা আমার চর্চার বিষয় ছিল না। আমার বিচার্য বিষয় ছিল বাংলাভাষার একটি অন্য গুণ। শব্দার্থের বিচারে সব ভাষার যে-গুণ রয়েছে, আমাদের বাংলাভাষার সে-গুণ তো রয়েইছে, তার একটি অন্য গুণও রয়েছে। আর এই দ্বিতীয় গুণটিই আমার বিচার্য ছিল। আর এখন পর্যন্ত যতটা জানতে পেরেছি, সে-গুণটি প্রাচীন সংস্কৃতেরও ছিল (আধুনিক সংস্কৃতের নয় কিন্তু)। প্রাকৃত বা প্রাকৃত-অপভ্রংশের, কিংবা গৌড়-প্রাকৃত বা তার অপভ্রংশের এই দ্বিতীয় গুণটি ছিল কি না আমি জানি না (কারণ সে-গবেষণা আমি করিনি)। থাকা অসম্ভব নয়। থাকতেই পারে। থাকলে ভালোই। আমরা তখন বলব বাংলাভাষা গৌড়-প্রাকৃত থেকে এসেছে। কিন্তু তাতে আমার মূল ভাবনার একটুও অদলবদল হচ্ছে না। আমার কথা হল, আমাদের বাংলাভাষার এই দ্বিতীয় গুণটি আর যে-ভাষার ছিল বা আছে, তা সংস্কৃত, প্রাকৃত, গৌড়ীয়, কিংবা ইংরেজি ল্যাটিন যাই হোক না কেন, সেই গুণটি আর যারই রয়েছে, আমাদের বাংলাভাষা আর সেই ভাষাটি বা সেইরকম ভাষাগুলি একই বংশের সন্তান। তবে সেটিও আমার খুব দরকারি কথা নয়। আমার সবচেয়ে দরকারি কাজের কথা হল—বাংলাভাষার এই দ্বিতীয় গুণটি মহত্তম, সেটি খানিকটা বিস্মৃতির দিকে এগিয়ে গেছে, তাকে পুনরুদ্ধার করা দরকার এবং কাজে লাগানো দরকার, আর সেটি আমাদের খুবই কাজে লাগবে। কেবল তা-ই নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও তা বিপুল সহায়তাকারী হবে।

বাংলাভাষার এই দ্বিতীয় গুণটি কী সেকথা আর একবার বলে নেওয়া দরকার। বাংলা অভিধানগুলি ওলটালেই দেখা যায়, বাংলাভাষায় শব্দের অর্থারোপণ ও অর্থ-নিষ্কাশনের পদ্ধতিটি দুরকম। (দুরকম কেন? আমার সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই প্রশ্নটি।) ইংরেজি প্রভৃতি সমস্ত ভাষার শব্দের অর্থারোপণ ও অর্থ-নিষ্কাশনের একটিই নিয়ম—তাকে বলা হয় লোগোসেন্ট্রিক (বিশেষ্যভিত্তিক)। ইংরেজিতে body বললে লোকে 'দেহ'টাকে বোঝে। কিন্তু শব্দটির ভিতরে ওই মানেটা লুকিয়ে নেই, রয়েছে পরম্পরায়। একই কথা বলা হয় আধুনিক বাংলা ও আধুনিক সংস্কৃতভাষাতেও। কিন্তু বাংলাভাষায় অর্থারোপণ ও অর্থ-নিষ্কাশনের আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। সেটি ওই 'দেহ' শব্দটির ভিতরেই বিদ্যমান। সে-মানেটি বের করতে হয় 'দিহ্' ক্রিয়া থেকে, যার থেকে 'দেহ' শব্দটির মানে হয়—'যাহা বাড়ে'। বিশ্বাস না হলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখে নিতে পারেন। সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে দেহ মানে 'যাহা বাড়ে'। আপনি বলবেন, যা ব্বাবা, যাহা বাড়ে সেটা দেহ! এ কেমন কথা? হ্যাঁ, প্রথম প্রথম এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। ইংরেজি ভাষা ও দর্শনের চাপে আমরা চট করে অন্যরকম ভাবতে পারি না, আমাদের 'আদি বাঙালি' পূর্বপুরুষদের মতো ভাবতে পারি না।

আসলে, আধ গ্লাস জল নিয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এতদিন আমাদের 'পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি' ও 'নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি' কাকে বলে শেখাতেন–যে-ব্যক্তি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে জগদ্দর্শন করে সে বলে, 'গ্লাসটিতে অর্ধেক জল আছে', আর যে-ব্যক্তি নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে দুনিয়া দ্যাখে সে বলে, 'গ্লাসটির অর্ধেকটা খালি', এবং সন্দেহ নেই এই নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিটা ভারি মন্দ! কিন্তু গ্লাসটি যদি একটি বাড়ির ছাদের জলের ট্যাঙ্ক হয়, যা কিনা প্রতিদিন সকালবেলা ভর্তি হয়ে যায়, তারপর পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় খালি হয়ে যায়, সেটিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে? পজিটিভি না নেগেটিভ?

আমাদের দেহটার (body-টার) কথা ধরুন-না কেন। জন্মানোর পর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সে কেবল ভরছে, ভরাট হচ্ছে, বৃদ্ধিলাভ করছে, বাড়ছে; পঞ্চাশের পর থেকে সে আবার উলটো-মুখো, তখন সে ক্রমশ হ্রাস পায়, মেদ-মাংস ঝরতে থাকে, খালি হয়, শীর্ণ হয় এবং একসময় মরে যায়। একে কোন দিক থেকে দেখবেন? পজিটিভি না নেগেটিভ? না, পাশ্চাত্যের হাতে এরকম প্রশ্নের কোনো উত্তরই নেই। উত্তর রয়েছে আমাদের বাংলাভাষীদের হাতে। আমরা, যারা বাংলাভাষায় কথা বলি, তারা উত্তরটি বংশপরম্পরায় জানি। আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন। তাঁরাই মানুষের body-টার দুটো নাম দিয়েছিলেন–'দেহ' ও 'শরীর'। (আর সে-নামটা তাঁরা প্রাকৃত, গৌড়ীয়, না সংস্কৃত, কোন ভাষা থেকে শিখে দিয়েছিলেন, না নিজেরাই দিয়েছিলেন, কে জানে!) যখন ভরাট হচ্ছে, বাড়ছে, বৃদ্ধিলাভ করছে, ফবাবষড়ঢ়রহম, তখন এর নাম 'দেহ' আর যখন developed এবং শীর্ণ হবার পালা, তখন এর নাম শরীর। তাই, তাঁরা 'দেহ' শব্দটি তৈরি করেছিলেন 'দিহ্' ক্রিয়া থেকে, যার মানে 'বৃদ্ধি পাওয়া', 'বাড়া'। আর, 'শরীর' শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল 'শৃ' ক্রিয়া দিয়ে, যার মানে শীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ, শরীর হল সেই বস্তু 'যা শীর্ণ হয়'।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাংলাভাষার শব্দের ভিতরে অর্থারোপণ ও অর্থ-নিষ্কাশনের আরও একটি নিয়ম অনুসরণ করতেন। আর এই দ্বিতীয় নিয়মটি কেবল আমাদের 'দেহ' ও 'শরীর' এই দুটি শব্দের ক্ষেত্রেই বহমান রয়েছে, তা নয়। আমাদের বাংলাভাষার অধিকাংশ শব্দের ভিতরেই ওই গভীর তত্ত্বটি বহমান রয়েছে, যে-তত্ত্বটি এমনকি পাশ্চাত্যের মহা মহা পণ্ডিতদের হাতেও নেই। অর্থাৎ বাংলাভাষী মাত্রেই অতীব মূল্যবান শব্দাবলি অনায়াসে বহন করে নিয়ে চলেছেন, নিজে তাঁর মানে যথার্থভাবে জানুন, চাই না-জানুন। আর, এই বহনের অভ্যাস বাংলাভাষীদের মনের এত গভীরে প্রোথিত যে, আমরা বাংলাভাষীরা বয়স্ক মানুষকে সাধারণত জানতে চাই 'শরীর কেমন আছে', 'দেহ কেমন আছে' জানতে চাই না। আর, আমাদের আউল-বাউলদের দেহতত্ত্বেরই সাধনা তো রয়েছেই।

তবে হ্যাঁ, আমরা যারা একালের লেখাপড়া-জানা বাংলাভাষী, আমরা কিন্তু এতদিন জানতাম 'দেহ' মানে body, 'শরীর' মানেও body। (মান্যবর মঈন চৌধুরী যেমন বলেছেন–দার, কলত্র, স্ত্রী সব কথাগুলির মানেই বউ।) 'দেহ' মানে 'যাহা বাড়ে', 'শরীর' মানে 'যাহা শীর্ণ হয়'–এরকম কথা আমাদের বাংলাভাষীদের পুরোনো বইপত্রে লেখা থাকলেও, আমাদের আধুনিক বাঙালিদের তা পড়ানো হয়নি, জানানো হয়নি। কেন জানানো হয়নি, সে অনেক কথা।

তার মানে–বাংলাভাষা দুরকম। এবং এটাই বাস্তব সত্য। যে-বাংলাভাষায় এখন আমরা কথা বলি, লেখালিখি করি তাতে 'দেহ' মানে body। আরেক রকম বাংলাভাষা আমাদের অভ্যাসে এখনও আমাদের অনেকের অজ্ঞাতসারেই রয়েছে, তাতে 'দেহ' মানে 'যাহা বাড়ে'। এই দ্বিতীয় রকমের বাংলাভাষা এখন ব্যবহৃত হয় কম, হয় খানিকটা আমাদের অজ্ঞাতসারেই, যদিও আমাদের পুরনো গ্রন্থ, অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে তা রেকর্ডেড রয়েছে। আর, আমি বাংলাভাষার এই দ্বিতীয় গুণের কারণ অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম। বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে নাকি প্রাকৃত থেকে এসেছে, আমি তা খুঁজতে যাইনি।

এরপর মান্যবর মঈন চৌধুরী এনেছেন শাশুড়ি-বউমার প্রসঙ্গ। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তর আপত্তি করেছেন এবং প্রসঙ্গটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু এর মূল ত্রুটিটি ধরতে পারেননি। তাই শেষ পর্যন্ত বলে বসেছেন–'সংস্কৃত বাংলা-বউমার শাশুড়ির শাশুড়ির শাশুড়ির শাশুড়ি-জাতীয় সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করছে বলা যায়। কলিম যে বললেন : বাংলাভাষার (বউমার) শাশুড়ি সংস্কৃত, তা মনে হচ্ছে ঠিক নয়।' অর্থাৎ আমার ভুল কথাটি তিনি নাড়াচাড়া করে প্রচুর আপত্তি-টাপত্তি করে শেষমেষ একটু বদলে নিয়ে গিলে ফেললেন।

না। সংস্কৃতভাষা ও বাংলাভাষার সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে, বিশেষত বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাংলাভাষার বিকাশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলাভাষার বিরোধের বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে, শাশুড়ি-বউমার উদহারণ টানা আমার ঠিক কাজ হয়নি। শাশুড়ি-বউমার উদাহারণ না টেনেও বিষয়টি বোঝানো যেতে পারত। এবং সেটিই করা আমার উচিত ছিল। কেননা একরম উদাহরণ পাঠককে একরকম ফাঁদে ফেলে দিতে পারে। এবং দিয়েছেও। মান্যবর মঈন চৌধুরী স্বয়ং সে-ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। এই ফাঁদটি দেখে ফেলেন আমার সহযোগী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীরবি চক্রবর্তী। কিন্তু তখন তো নিবন্ধটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দু-জায়গাতেই এবং কলকাতায় তা ছাপাও হয়ে গেছে। তাই এ-নিবন্ধে সেটি সংশোধনের উপায় আর আমার হাতে ছিল না।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবি চক্রবর্তী ও আমার যৌথভাবে লেখা গ্রন্থ 'বাংলা বানান বাংলা ভাষা'তে রবি চক্রবর্তীর কলমে এই শাশুড়ি-বউমার বিষয়টি যথাসম্ভব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, '... একটা আলোচনা আজ থেকে বারো-তেরো বছর আগে শুরু হয়–সংস্কৃত বাংলাভাষার মা না দিদিমা, নাকি আরও আগের কোনো পর্যায়ের জননী? এই নিয়ে নানারকম বক্তব্য রাখা শুরু হয়। যে-সরল সত্যটি এক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তা হল এই যে, যেকোনো বহতা ধারার ক্ষেত্রে এই জাতের আলোচনা নিরর্থক। ভাষা তো নদীর মতো। আজকের ভাষা এবং কালকের ভাষার মধ্যে ছেদ নেই। উপরন্তু তাতে সব সময় পরিবর্তন হতে থাকে। অতি অল্পমাত্রায় এই পরিবর্তন চলে বলেই, এই পরিবর্তন বা বদলটা ধরা পড়ে লম্বা লম্বা সময়ের ব্যবধানে। সেই বিচারে ভাষা আর নদী দুই-ই হল ধারা, যদিও দুরকমের জিনিসের। নদীর বেলায় হরিদ্বারের গঙ্গা, কাশীর গঙ্গা, পাটনার গঙ্গা–এদের মধ্যে মা-দিদিমা-জাতীয় পার্থক্য আনা যায় কি? মা-দিদিমা ইত্যাদির প্রত্যেকের মধ্যে দেহগত অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য আছে, এবং প্রত্যেকের অস্তিত্বের আরম্ভ আছে, শেষও আছে। ভাষা বা নদীর ক্ষেত্রে সেই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর জন্য মা-দিদিমা ইত্যাদির চটজলদি তুলনা যথেষ্ট হলেও

হতে পারে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যে আলোচনায় এই তত্ত্বটির ব্যবহার অকারণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।'

যাই হোক, আমার এই ত্রুটিটি মঈন সাহেব ঠিকঠাক দেখাতে পারুন আর না-ই পারুন, তিনি যে অন্তত আমার নিবন্ধের ত্রুটির জায়গাটিতে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিমতো আপত্তি তুলেছেন, সেজন্যেই আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

নয়.

মন না চিনে মুড়োয় কেশ

মান্যবর মঈন চৌধুরী জানিয়েছেন, আমি পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের যে-বিরোধিতা করেছি সেটি নাকি ঠিক। 'পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ' শব্দদুটো শুনে মান্যবর মঈন চৌধুরীর মনেও নাকি 'পুরুষাঙ্গ ও যোনির ছবি আসেনি'। এইসব বলে আমার নামে 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার' অভিযোগ এনে, অনেক মন্দ মন্দ কথা বলে, তারপর একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'মানুষের মস্তিষ্কে কী ধরনের Electro-chemical ও Quantum-Mechanical ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়' তা নিয়ে তাঁর নিষ্ফল গবেষণার ('এখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট সমাধান পাইনি') বর্ণনা দিয়ে 'পৃথিবীবিখ্যাত পদার্থবিদ রোজার পেনরোজ-এর বক্তব্য'-এর একটি তেরো লাইনের ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়ে তার পরে বাংলাভাষার সমস্যা-বিষয়ে ফিরে এসেছেন। আমি তাঁর মন্দ মন্দ কথায় কান দেব না এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েও যাব না। আমি বাংলাভাষার সমস্যা সমাধানের বিষয়েই থাকব।

আমি জানতে চাইব, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদুটি শুনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে যখন penis ও vagina-র ছবি ভেসে ওঠে, তখন মান্যবর মঈন চৌধুরীর মনে তেমন ছবি ভেসে ওঠে না কেন? হে পাঠক পাঠিকা, শব্দদুটি শুনে আপনার মনে কীসের ছবি ভেসে ওঠে? নিজের মনকে ভালো করে শুধিয়ে দেখুন। কারণ এর উত্তর থেকে আপনি নিজেই বাংলাভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সামাধান করে ফেলবেন। যদি উত্তরটি সুনীলবাবুর মতো হয়, তা হলে জানবেন, আপনার মনের ভিতরে যে-ভাষাদর্শন সক্রিয় সেটি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (বিশেষ্যভিত্তিক) ভাষাদর্শন, প্রাচীন বাংলাভাষার ভাষাদর্শন আপনার মনের ভেতরের চেয়ারটি তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে। আর যদি উত্তরটি মঈন সাহেবের মতো হয়, বুঝবেন, আপনার মনের ভিতরে এখনও প্রাচীন বাংলাভাষার (ক্রিয়াভিত্তিক) ভাষাদর্শন সক্রিয় রয়েছে, আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভাষাদর্শনকে সে এখনও চেয়ার ছেড়ে দেয়নি। আর যদি দুজনের মতোই হয়, বুঝবেন, আপনি একজন সাধারণ বাংলাভাষী, আপনি দুটো ভাষাদর্শনই ব্যবহার করেন নিজের অজান্তেই এবং কোন ভাষাদর্শনকে কখন আপনার মনের ভিতরে বিচারকের চেয়ারে বসাতে হবে না-হবে, সেটি আপনার নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। যখন আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দর্শনকে বসানো হয়ে যায়, তখন সুনীলবাবুর মতো দেখেন; আর যখন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাদর্শনকে বসানো হয়ে যায়, তখন মঈন সাহেবের মতো দেখেন। এবং বলে রাখা ভালো, প্রায় সমস্ত সাধারণ বাংলাভাষীর স্বভাব এরকমই। প্রমাণ চাই? প্রমাণ দিচ্ছি।

পদচিহ্ন, পদাঘাত শুনলে আমাদের মনে 'পা'য়ের ছবি আসে, কিন্তু পদোন্নতি, পদচ্যুতি শুনলে পায়ের ছবি আসে না; যদিও সব ক্ষেত্রেই পদ কথাটি রয়েছে। আবার সিদ্ধডিম, সিদ্ধচাল

শুনলে আমাদের মনে boiled egg, boiled rice-এর ছবি আসে, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধহস্ত শুনলে আমাদের ওরকম কোনো ছবি আসে না; যদিও সব ক্ষেত্রেই সিদ্ধ কথাটি রয়েছে।১৭ এরকম হয় কেন? হয় এইজন্যই যে, আমরা বাংলাভাষীরা আসলে ইতিহাসের মারে দুইরকম ভাষাদর্শনেই অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছি, নিজেদের অজান্তেই। যেহেতু আমাদের ভাষায় প্রাচীন বাংলাভাষার প্রচুর শব্দ রয়েছে, এবং সেগুলি গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বাংলাভাষার (ক্রিয়াভিত্তিক) ভাষাদর্শনের ওপর নির্ভর করে, আমরা পরম্পরাগতভাবে স্বভাবতই সেগুলিতে অভ্যস্ত। আবার, আমাদের সমাজ যেহেতু আরও বেশি বেশি করে পণ্যভিত্তিক ও পণ্যকেন্দ্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এবং হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সমাজকে ক্রমে বিশেষ্যভিত্তিক দর্শনের দিকে চলে যেতে হচ্ছে; তার ওপর ইংরেজ এসেছে তার পণ্যভিত্তিক মানসিকতা, ইংরেজি ভাষা ও তার আধুনিক ভাষাতত্ত্বের (বিশেষ্যভিত্তিক) ভাষাদর্শন নিয়ে, আমাদেরকে নিজেদের অজান্তেই ক্রমে আধুনিক ভাষাদর্শন আত্মস্থ করতে হয়েছে। তাই আমাদের মনের স্বভাবে এই দুই ভাষাদর্শনের যুগপৎ প্রয়োগের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আমাদের বাংলাভাষীদের মনে এই দুরকম ভাষাদার্শনিক ভিত্তি রয়েছে বলেই বাংলাভাষা এখনও স্বভাবতই দুরকম হয়ে রয়েছে।১৮ আর সেই কথাটিই আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি। ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব পড়ে বাংলাভাষার এই রহস্য কোনোদিন বোঝা যাবে না।

বাঙালি বলেই মাননীয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনেও দু-ধরনের দর্শনই সক্রিয়। কিন্তু হলে কী হবে, তিনি শনাক্ত করেছেন একটিকে। অপরটি তাঁর চোখেই পড়েনি। তার ফলে তিনি যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা মারাত্মক। তাঁর মতো একজন গণমান্য বাঙালি কবি, যাঁকে অনেকেই অনুসরণ করেন, তিনি ভুল কথা বললে যে অনেক ক্ষতি; তিনি তো একজন অখ্যাত অধ্যাপক নন। পাড়ার গোয়ালার দুধে বিষ থাকলে মরবে দশ-বিশ জন লোক, ক'জনই-বা তার দুধ কেনে। কিন্তু আমূল কোম্পানির দুধে বিষ থাকলে মরবে লক্ষ লক্ষ মানুষ (ভারতের আমূল কোম্পানির দুধ কয়েক কোটি লোক প্রতিদিন কেনে, খায়।)। তাই সুনীলবাবুকে আটকানোর জন্য আমাকে 'শব্দের লিস্ট' করে দেখাতে হয়েছিল, 'বাগবিস্তার' করতে হয়েছিল।

মান্যবর মঈন চৌধুরীর আবার অন্য সমস্যা। তাঁর মনের ভেতরের চেয়ারটি যে দখল করে রেখেছে প্রাচীন বাংলাভাষার (ক্রিয়াভিত্তিক) দর্শন, সে-খবরটাই তাঁর কাছে নেই। যদিও তাঁর বাকি সব কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, তিনি নিজেকে আধুনিক ভাষাদর্শনের লোক বলে ভাবেন অথচ সেই আধুনিক ভাষাদর্শনটিকেও সুনীলবাবুর মতো ভালো করে আত্মস্থ করেননি, অথচ ডাণ্ডা নিয়ে প্রাচীন বাংলাভাষার (সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ) শব্দগুলির বিরুদ্ধে হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করতে লেগেছেন, সম্ভব-অসম্ভব ঘোষণা করতে লেগেছেন।

দশ.

...শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই!

তিনি লিখেছেন, আমাদের বাংলাভাষায় সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দের মোট পরিমাণ শতকরা ৮৫ শতাংশ। আর তা জেনেই তিনি ঘোষণা করেছেন, "আমি বলব : বাংলাভাষার সম্পদ হিসেবে সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি সব শব্দই থাকুক, এবং এই শব্দগুলোকে আমরা শুধু 'বাংলা' শব্দ হিসেবেই অভিধানভুক্ত করব।" তা হলে একধরনের সমতাবিধান তো

হয়েই যাবে। তারপর বানানের সমতাবিধান করে নিলেই হবে। আর সেটাও কীভাবে তিনি করতে চান, সে-ইচ্ছাও তিনি ব্যক্ত করেছেন–'আমি আসলে চাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা একটি একক চিন্তাকাঠামোর (Paradigm) ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধান করুন এবং তাঁরা গতিশীল বাংলাভাষার রূপ ও স্বরূপকে দেশকাল-গ্রাহ্য করে চৈতন্যের গতি নিয়ে অনুধাবন করতে শিখুন।'

মান্যবর মঈন চৌধুরীর এবম্প্রকার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বা কারণ কী? 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার' ফেলে দেওয়ার কথা তো তিনি আগেই 'অস্পষ্টভাবে' বলে দিয়েছেন। এবার তিনি চান, বাংলা শব্দভাণ্ডারের সমস্ত শব্দকেও ইতিহাসহীন করে, তাদের প্রত্যেকের গায়ে অতীতের যে-বেশভূষা এখনও লেগে রয়েছে তা সব খুলে ফেলে দিয়ে শব্দসমূহের প্রাথমিক সমতাবিধান করে দেওয়া হোক–সব শব্দের এক জাত, বাংলা। এদেশের লক্ষ লক্ষ শূদ্র-বৌদ্ধ-আদিবাসীরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তখন এই সমস্যাই দেখা দিয়েছিল। রামা কৈবর্ত তো কলমা পড়ে রহিম শেখ হয়ে গেল, কিন্তু তার বাপের নাম যে দশরথ কৈবর্ত থেকে গেছে, তার কী হবে! রহিম শেখ এখন বিপদে পড়লে পিতৃনাম স্মরণ করবে কী করে! করলে, যে-পিতার নাম উচ্চারিত হয়ে যাবে, সে যে হিন্দু! একই সমস্যায় পড়েছেন মান্যবর মঈন চৌধুরী। আর, সে-সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি উপায় তিনি অনেক ভেবেচিন্তে বের করেছেন–রহিম শেখের বাপ নাই! সে এক ভুঁইফোড় বাঙালি। বাংলা শব্দসমূহের পিতৃপরিচয় বংশপরিচয়, এসব নাই। তারা সব মাটি ফুঁড়ে বেরোনো বাংলা শব্দ! বাঙালি মুসলমান ও তাদের মুখের ভাষা, উভয়েই ভূসুত, ভুঁইফোড়।

তা হলে, শুরুতে ভদ্রলোক যে আমাদের 'ঐতিহ্য-ইতিহাস' ও 'প্রকৃত ইতিহাস' ইত্যাদির কথা বলছিলেন, সেসব কি বাজে কথা? না। সেটা তাঁর পুরোটাই বাজে কথা নয়। আধুনিকতাবাদীদের দুনিয়ায় মিশতে গিয়ে (প্রকৌশল-বিজ্ঞানীরূপে হিল্লি-দিল্লি ঘুরতে গিয়ে) তিনি শিখেছেন, মানুষের ইতিহাস থাকে এবং তা খোঁজা মানুষের আধুনিকতার লক্ষণ। তাই তিনি বিশ্বাস করেছেন, তাঁর নিজেরও ইতিহাস রয়েছে এবং তা খোঁজা দরকার। কিন্তু তাঁর এইসব বিদ্যা স্বোপার্জিত নয়, ইয়োরোপীয় মডার্নিজম থেকে অনুকরণ করে পাওয়া। তাই ঐ বিদ্যার গভীরতা তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারেননি। সেজন্যেই মুখে ওসব বললেও কার্যক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই করেন।

শব্দের পিতৃপরিচয় ও বংশপরিচয় রাখা না-রাখা বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একবার ইয়োরোপের দিকেই নাহয় তাকানো যাক। তাঁরা কী করেন? ইংরেজির কথাই ধরুন। তাতে অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি, পেছন দিকে যতদূর পর্যন্ত তাঁরা দেখতে পান, ততদূর পর্যন্ত শব্দের ইতিহাস তাঁরা একেবারে অক্ষতই রেখেছেন। যে-শব্দের আদি উৎস ল্যাটিন বা গ্রিক, তাকে ল্যাটিন বা গ্রিক থেকে আগত বলতে তাঁদের লজ্জা করেনি। আমরা যেমন তদ্ভব-বাংলাশব্দ, তৎসম-বাংলাশব্দ বলে বাংলাকে সংস্কৃত (বা প্রাকৃত) থেকে আলাদা করে নেওয়ার বাহাদুরি করেছি,১৯ তদ্ভব-ইংরেজিশব্দ নাম দিয়ে কোনো শব্দকে তাঁরা ল্যাটিন বা গ্রিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার বুদ্ধি খাটাননি। উলটে তাঁদের দুঃখ এই যে, তাঁরা তাঁদের শব্দের আদি উৎসটা আরও ভালো করে জানেন না কেন। আর আমরা? ইংরেজের তুলনায় আদি উৎসটা অনেক ভালো জানা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ভাষার সেই ইতিহাসের সম্পর্কসূত্র কেটে দিয়ে

নিজেদের অনাথ করে নেওয়ার নানারকম কলকব্জা আবিষ্কার করেছি, করছি। একে কী বলা যাবে? আধুনিক হওয়া?

তবে এখানেই মান্যবর মঈন চৌধুরী থেমে থাকেননি। তিনি চান দুই বাংলার পণ্ডিতরা 'একক চিন্তাকাঠামোর' ওপর দাঁড়ান। তারপর তাঁরা 'বাংলাভাষার বানানের সমতাবিধান করুন এবং তাঁরা গতিশীল বাংলাভাষার রূপ ও স্বরূপকে দেশকাল-গ্রাহ্য করে চৈতন্যের গতি নিয়ে অনুধাবন করতে শিখুন।'

'একক চিন্তাকাঠামো' জিনিসটি কীরূপ? বুশ সাহেব যেরকম সারা পৃথিবীকে 'একক চিন্তাকাঠামো'র ছাঁচে ঢালতে চান, সেরকম? নাকি লাদেন সাহেব যেরকম সারা দুনিয়াকে 'একক চিন্তাকাঠামো'র ছাঁচে ঢালতে চান, সেরকম? না, এ-বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাদের দেননি। হতে পারে সেটি বুশের, লাদেনের, হিটলারের বা স্টালিনের 'একক চিন্তাকাঠামো'র মতো, আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায়, সেই 'একক চিন্তাকাঠামো'র মানে হল 'যেখানে সব শেয়ালের এক রা' হবে।

অতএব, তিনি আমাদের 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার' ফেলে দিয়ে বাংলাভাষার সব শব্দের ইতিহাস মুছে দিয়েই ক্ষান্ত হতে চান না, তিনি চান, এরপর 'সব শেয়ালের এক রা' হবে এরকম একদল পণ্ডিত বাংলা বানানের সমতাবিধান করুন। তবে হ্যাঁ, সেরকম একদল পণ্ডিত পেলেই হবে না, তাঁরা যেন মান্যবর মঈন চৌধুরীর কাছ থেকে 'গতিশীল বাংলাভাষার রূপ ও স্বরূপকে দেশকাল-গ্রাহ্য করে চৈতন্যের গতি নিয়ে অনুধাবন করতে' শেখেন তারপর বানানের সমতাবিধানের কাজে হাত দেন। কারণ, ওরকম '... অনুধাবন' করা যে কীরকম ব্যাপার, ভাষাচর্চার দুনিয়ায় কেউ তা জানে না।

এগার.

ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঝাড়ুদার খুঁজছেন কেন?

মান্যবর মঈন চৌধুরী দুটো কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন, 'ভাষা থেকে শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন, এমন দক্ষ ভাষা-ঝাড়ুদার আছেন কি? ভাষা থেকে শব্দ মুছে ফেলা কিংবা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা আদৌ সম্ভব কি? আমি জানি কলিম এবার স্বীকার করবেন যে ভাষা থেকে শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন, এমন দক্ষ ঝাড়ুদার পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশে নেই এবং এমন কাজ করা সম্ভবও নয়।'

আমি তাঁকে কী বলব? ভাষার শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা তো সামান্য ব্যাপার, গোটা গোটা ভাষাকেই পৃথিবী থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হচ্ছে এবং তা-ও একটি দুটি ভাষা নয়, শত শত ভাষাকে। এ-বিষয়ে বহু গ্রন্থ রয়েছে। আমার গ্রন্থেও রয়েছে।২০ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের রূপকার বাংলাদেশের নাগরিক মান্যবর মঈন চৌধুরীর জানা উচিত ছিল যে, পৃথিবীর মানুষের মাতৃভাষাগুলি আর যাতে উবে না যায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেওয়ালটি বাংলাদেশই গড়ে তুলেছে! দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্তের ক্ষুদ্রতম জাতিটিও, বাংলাদেশের নাম হয়তো না জেনেই, প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচানোর শপথ নেয়।

আর, শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা? আমাদের ভাষায় একই সত্তা বহু ক্রিয়া করে বলে তার ছিল অনেকগুলি করে নাম। ১০৮টা নামও কারও কারও ছিল, আর ১০-২০টা নাম তো

হামেশাই। কিন্তু ক্রিয়ার দিক থেকে না দেখে কর্তার দিক থেকে দেখলে, কর্তা তো একটিই। 'দেহ', 'শরীর', 'অবয়ব', 'কায়' সবাই তো আসলে body! ব্যস! চারটে শব্দ হয়ে গেল একটি। যেমন আগেই দেখিয়েছি, sun-এর সঙ্গে বদলাবদলি করতে গিয়ে আমরা সূর্য্যের ২০টি সমজাতীয় শব্দকেই বলতে গেলে ফেলে দিয়েছি, রেখেছি কেবল সূর্যকে, কিংবা মান্যবর মঈন চৌধুরী যেমন দেখিয়েছেন–দার, কলত্র, স্ত্রী, বধূ (বউ) সবই আসলে বউ, অতএব বউকে রেখে বাকিদের ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিলেই হয়। ঠিক এই মানসিকতায় বিপুল পরিমাণ শব্দ ফেলে দেওয়া হয়েছে। এভাবে বাংলাভাষায় এই শব্দবর্জন কী হারে এবং কীভাবে চলেছে, চলছে তার বিবরণ আমি অন্যত্র দিয়েছি। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা কীভাবে কতখানি ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে আমার 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব...' নিবন্ধে, যা কলকাতার 'অপর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার কপি আবহমান-এর নির্বাহী সম্পাদকের কাছেও পাঠিয়েছি। এখানে সে-বিষয়ের অবতারণা করে নিবন্ধের আয়তন আর বাড়ানো যাবে না।

আর, জ্ঞাতসারে এবং আরও সূক্ষ্মভাবে এই ঘটনা কত ঘটানো হয়েছে, সে-বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে হলে কমপক্ষে আর-একটি নিবন্ধ লাগবে। আমাদের চোখের সামনেই উগ্র হিন্দিওয়ালারা হিন্দিভাষা থেকে প্রায় সমস্ত আরবি-ফারসি শব্দকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছেন। একই কাণ্ড করেছেন উগ্র তামিলপ্রেমীরা সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে। ...

এসব ঘটে খুব ধীর গতিতে, কিন্তু অবশ্যই ঘটে যদি সেইরকম নীতি (ঝাঁটা) গ্রহণ করা হয়। আর মান্যবর মঈন চৌধুরী তো সেরকম নীতিই গ্রহণ করবার সুপারিশই করছেন।

বার.

স্পেল-চেক বনাম লোকসান চেক

যাই হোক, এরপর তিনি কমপিউটার বিষয়ে ছবি এঁকে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, কমপিউটার স্পেল-চেক নিয়ে আমি যা বলেছি, তা ঠিক নয়। তাঁর মতে, কোনো স্পেল-চেক সফটঅয়ার বাংলাভাষায় বানানো যায় না, এমন নয়। বানানো যায়। মান্যবর মঈন চৌধুরী একজন প্রকৌশল-বিজ্ঞানী। কমপিউটারের বিষয়ে তিনি অনেক কিছু জানবেন সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ছবি এঁকে বোঝানোর অধিকার তাঁর আছে।

তবে তিনি নতুন কিছু বোঝাননি। স্পেল-চেক বাংলাভাষায় কতটা বানানো যায়, সে-বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই যা জেনেছি, তারই কিয়দংশ তিনি ছবি এঁকে আমাদের জানিয়েছেন। হ্যাঁ আমরা জানি, বাংলাভাষায় এই বানান-নৈরাজ্যের মধ্যেও একরকম স্পেল-চেক বানানো যায়, আমাদের পশ্চিমবাংলায় দু-তিনটি সংস্থা বানিয়েছেও; কিন্তু ইংরেজির মতো বানানো যায় না। ইংরেজি স্পেল-চেক প্রুফ-রিডারের কাজটা ৮০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। বাংলা স্পেল-চেক প্রুফ-রিডারের কাজটা খুব বেশি হলে ২০ শতাংশ মাত্র কমাতে পারে। আমি প্রকাশনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। আমাকে এই লোকসান নিয়ত সইতে হয়। গাঁটের কড়ি খসিয়ে বুঝতে হয়, এই বানান-নৈরাজ্যের মধ্যে বাংলা স্পেল-চেক সফটঅয়ার এখন পর্যন্ত কতটা কাজের হয়েছে। বুঝতাম না, যদি আমাকে নিজেকে ডিটিপি করে, প্রুফ দেখে, ছাপা বাঁধাই পর্যন্ত সবটা নিয়মিত করাতে না হত। আমি জানি, যতদিন বাংলা বানানের নৈরাজ্য দূর করা না যাবে, ততদিন সব

বাংলা প্রকাশনাকে সময় ও অর্থের এই লোকসান মেনে নিতেই হবে, ততদিন বাংলা প্রকাশনার খরচ ইংরেজি প্রকাশনার তুলনায় বেশিই পড়বে।

তের.

আনিলাম অপরিচিতের নাম...

মান্যবর মঈন চৌধুরী তাঁর 'প্রতিক্রিয়া'মূলক নিবন্ধের সূত্রপাতে দুটি আলটপকা মন্তব্য করেছেন। আমার প্রবন্ধটি নাকি 'মূলত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্যের সমালোচনা, আর প্রবন্ধটিতে এমন কিছু বক্তব্যের উপস্থিতি আছে যা সমকালীন ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না।'

আমি যে 'আধুনিক বাংলা' বানান সংশোধনের ও 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ' লেখার বিষয়ে সুনীলবাবুকে সমর্থন করলাম, সেটি মান্যবর মঈন চৌধুরীর চোখে পড়েনি। কেবল আপত্তিটাই তিনি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু সেটাও যে ঠিক ঠিক ভাবে দেখলেন, তা-ও নয়। আমি যে সুনীলবাবুকে কেবল ব্যক্তি হিসেবে দেখিনি, এক বৃহত্তর বাঙালি শিক্ষিত মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে সসম্মানে দেখেছি, একটি 'বিশিষ্ট-মত' হিসেবে দেখেছি এবং সেরকম লিখেছিও; তা-ও তিনি দেখতে পাননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামতের সমর্থনের সাথে সাথে আমার বাড়তি কথাটি রেখে আমি যে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছি; সেটিও মান্যবর মঈন চৌধুরী গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেননি।

আমি দেখিয়েছি, সুনীলবাবুর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল বাংলাভাষা একটি, আমার প্রস্তাবের ভিত্তি হচ্ছে বাংলাভাষা দুটি। তিনি যে-বাংলাভাষাটিকে চেনেন, তার জন্য তিনি যে-নিদান চিন্তা করেছেন, ছোটখাটো দু-একটি পদ্ধতি-বদলের কথা বলে, আমি তার সমর্থন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি দ্বিতীয় বাংলাভাষাটির বিষয়েও কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। আমার আপত্তি এইখানে যে, আমার বিচারে বাংলাভাষা যেহেতু দুরকম, এক বাংলাভাষার জন্য তৈরি করা ঔষধ (যে-ঔষধের ব্যাপারে সুনীলবাবুরা ভাবছেন) অন্য বাংলাভাষাকে যেন খাইয়ে দেওয়া না হয়। তা হলে সে-বেচারা তৎক্ষণাৎ মরে যাবে।

এসব না-দেখে আমার নিবন্ধটিকে 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সমালোচনা' বলে দেগে দেওয়া অনুচিত। এ-ধরনের কথাবার্তা, মূল সমস্যা থেকে আমাদের সরিয়ে দেয়। বাংলাভাষা ও তার বানান-সমস্যা নিয়ে যে-ভাবনাচিন্তা, এর ফলে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। আমার নিবন্ধে যদি সেরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা দৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে আমার উপস্থাপনের ত্রুটি বলেই আমি মনে করি। আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয় কথা হল মান্যবর মঈন চৌধুরী বলেছেন, 'একালের ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও বিজ্ঞানভাবনা' আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে না।

করেই না তো! আমিও তো তা-ই বলছি। আমার বক্তব্য প্রচলিত ভাষাতত্ত্বকে সমর্থন করে না। প্রচলিত ভাষাতত্ত্বও আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে না। করবে কী করে! আমি যেকথা বলছি, সেটি যে ভাষাতত্ত্বের দুনিয়ায় অপরিচিত কথা, একটি নতুন আবিষ্কারের কথা। সে-আবিষ্কারকে যখন সবাই বুঝে নেবেন, মেনে নেবেন, তখনই কেবল আমার বক্তব্যকে প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব আত্মসাৎ করে নিয়ে তার অঙ্গীভূত করে নেবে। তার পর থেকে প্রচলিত ভাষাতত্ত্বও

আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। তার আগে নয়। সব নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই এমন হয়। অ্যাকাডেমি নতুনকে গ্রহণ করার আগে ভেবে দেখতে অনেক সময় নেয়, যে-কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারক মরে যাওয়ার পর তাকে নিয়ে হৈ হৈ শুরু হয়।

তবে, ধ্বনিতত্ত্বকে আমার বক্তব্য সমর্থন করে কি করে না, সে-প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে পারব না। কারণ দুটি। এক. প্রচলিত ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। দুই. আমি প্রচলিত ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে কোথাও কিছু সচেতনভাবে লিখিনি। যদি আমার অজ্ঞাতসারে লেখা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেকথাও আমি জানি না। কেউ কখনো বলেনি। আর তৃতীয় কথা, আমার বক্তব্য বিজ্ঞানভাবনার বিরোধী বলতে মান্যবর মঈন চৌধুরী কী বলতে চান, তা-ও আমি জানি না। তিনি বলেননি। নিজেকে আমি বিজ্ঞান-অবিরোধী বলেই জানি। কোথাও কিছু উলটো করে থাকলে, সেটি আমায় একটু দেখিয়ে দিলেই হবে। শিখতে আমার লজ্জা করে না এবং শিক্ষকের জাত-ধর্ম-বয়স-লিঙ্গ কিছুই আমি বিচার করি না।

এ ছাড়া, মান্যবর মঈন চৌধুরী কিছু খুচরো প্রসঙ্গ তুলেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ছেঁচকি ঘণ্ট ... প্রভৃতি শব্দ এবং বাংলাদেশের ওয়ালিমা রুকু ... প্রভৃতি শব্দ নিয়ে। আমি মনে করি, এরকম থাকাই স্বাভাবিক। বাংলাভাষার পাঁচভুবনের প্রত্যেকেরই কিছু নিজস্বতা রয়েছে, থাকবেও। বাংলাভাষার মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি বড়ো কোনো সমস্যা নয়।

তিনি পত্র কথাটি শুনেছেন, জানেন, ব্যবহারও করেন কিন্তু 'ত্-এ ত্-র-ফলা' 'পত্ত্র' (কমপিউটারে পুরনো হরফ নেই বলে এভাবে লিখতে হচ্ছে) শব্দটি আগে কখনো শোনেননি। এরকম আরও অনেক কিছুই তিনি আগে শোনেননি বলে জানিয়েছেন। কিন্তু সে তো আমার অপরাধ নয়! হ্যাঁ, ত্-এ ত্-র-ফলার যে পৃথক অর্থ হয়, তা 'গায়ত্রী' ও 'গায়ত্ত্রী' শব্দের অর্থের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে দিয়ে গেছেন শ্রীকালীপদ শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ তাঁর 'নিত্যকর্ম্ম-প্রদীপ' গ্রন্থে। এরকম কত খুচরো বিষয় যে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

মান্যবর মঈন চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন, 'পদার্থবিজ্ঞানী কি দর্শন লেখেননি আগে?' কে বলেছে? আমি তো বলিনি। তবু আমার ওপর চোটপাট করে তিনি কত পদার্থবিজ্ঞানী কী কী দর্শনের বই লিখেছেন তার ফিরিস্তি দিতে লেগেছেন। তাঁর মনে রাখা দরকার, এখানে ভাষাদর্শনের কথা হচ্ছে, সাধারণভাবে দর্শন নিয়ে আলোচনার কথা হচ্ছে না এবং তাতে আমাদের কোনো প্রয়োজনও নেই। আর, তিনি পদার্থবিজ্ঞানীদের যে-তালিকা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই 'ভাষাদর্শন' নিয়ে কোনো নিবন্ধাদি লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। এ আমার অজ্ঞতা হতে পারে। আমি জেনেছি যে, কেবল ডেভিড বোহ্মই তাঁর একটি গ্রন্থে 'ভাষাদর্শন' নিয়ে একটি দীর্ঘ ২১ পৃষ্ঠার চ্যাপটার লিখেছেন। আর যতটা জেনেছি, ভাষাদর্শন বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছেন হাইজেনবার্গ ও শ্রোয়েডিংগার। কিন্তু তাঁরা ভাষার দর্শনকে বিশেষ্যভিত্তিক ও ক্রিয়াভিত্তিক এই দুভাবে ভাগ করে দেখিয়েছেন, এমন কথা আমি জানি না। মঈন চৌধুরী তেমন জেনে থাকলে আমাদের সেকথা জানাতে পারতেন।

মান্যবর মঈন চৌধুরী স, শ, ষ, ন, ণ, ই, ঈ ইত্যাদি বিষয়েও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। বানানসংস্কার কেমনভাবে করা হবে, তার নীতি প্রণয়ন করে নেওয়ার পর, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নগুলি নিশ্চয় বিচার করতে হবে। আমার নিবন্ধ বাংলাভাষার বানানসংস্কারের মূলনীতির বিষয়েই ছিল। উদাহরণ দিতে গিয়েই যা দু-তিনটি খুচরো প্রসঙ্গ এসেছে।

মোট কথা, আধুনিক বাংলা বানানের সংস্কারের ক্ষেত্রে আমার কোনো আপত্তি নেই–সবাই মিলে একমত হয়ে, সার্ভে করে বা অন্য কোনোভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে করা যেতে পারে। সেভাবে 'আশ্চর্য্য' বানানটি 'আশ্‌চোজ্জ' করে দিলেও আমার আপত্তি নেই। আধুনিক বাংলাভাষায় সেভাবে, মঈন চৌধুরীর পরামর্শমতো 'সুন্দর বউ', 'আচার্য', 'অধ্যাপক শিরীন আক্তার' এসব করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু প্রাচীন বাংলাভাষার ক্ষেত্রে বানানটি অবিকল 'আশ্চর্য্য'ই রাখতে হবে। অন্যান্য সিদ্ধান্তও নিতে হবে এমনভাবে যাতে আমাদের ভাষার প্রাচীন সম্পদ হারিয়ে না যায়। বানান-বিষয়ে আমার মূল বক্তব্য এই।

যাই হোক, আমাদের বাংলাভাষার ভিতরে ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষার যে-স্বরূপ আমার চোখে পড়ে গেছে, তার কারণেই বাংলাভাষার বানানসংস্কারকদের আমি সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। তাঁরা যেন এই বাংলাভাষার দ্বিতীয় রূপটির কথাও মনে রাখেন। এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে না-বসেন, যাতে তার মৃত্যু ঘটে। বিষয়টি নতুন এবং বাংলাভাষীর স্বার্থের দৃষ্টিতে ও বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা অতীব মূল্যবান। দুই বাংলার বাঙালি পণ্ডিতরা, এই মুহূর্তে অল্পসংখ্যক হলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও শুরু করেছেন। তবে অ্যাকাডেমি এখনও এ-বিষয়ে তেমন এগিয়ে আসেনি। না-আসার অন্যতম কারণ হল, আমার কথা মানতে হলে, তাঁদের অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলে নিতে হবে, কিছু-কিছু ধারণা বর্জনও করতে হবে। সেটা তাঁদের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তবে সব নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই অ্যাকাডেমিকে এরকম করতে হয়, যে-কারণে নতুনকে গ্রহণ করতে তাঁদের সময় লাগে। অন্য বাধাও আছে।

আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির ফলিত প্রয়োগের কাজটা পরিমাণে অত্যন্ত কম হয়েছে। আগে আমি একা করছিলাম, এখন রবি চক্রবর্তী আর আমি করছি। অথচ এ যে অনেক বড়ো কাজ, অনেকে মিলে করার কাজ। এখনও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষ সংকলন করা শেষ হয়নি। কাজ চলছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থগুলির একটিকেও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে আগাগোড়া একালের পাঠকের বোধ্য করে অনুবাদ করার সময়ই পাওয়া যায়নি। দুই বাংলার অন্তত দশ-বিশ জন মিলে যদি কাজগুলোর খানিকটাও করতে পারতাম! তা নইলে কে করবে এত কাজ! (নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ ৬৭ জন পণ্ডিতে মিলে প্রায় ২০ বছর ধরে লিখেছিলেন।) আরও অন্তত কিছুটা কাজ না এগোলে, হবে না। কেবল রবি চক্রবর্তী মহাশয়ের ও আমার কয়েকটি গ্রন্থ আর বেশ কিছু নিবন্ধ দিয়ে যেটুকু ভূমি তৈরি হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করার ঝুঁকি আছে। তার মানে, আমি বলছি, যে-ভূখণ্ডের ওপর নির্ভর করা হবে, সেই দ্বীপটা তো এখনও যথেষ্ট জেগে ওঠেনি। তো, তাঁরা নির্ভর করবেন কোন ভরসায়। অ্যাকাডেমির বাধছে সেখানেও।

চৌদ্দ.

পৃথিবী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে

মানুষের ভাষার ইতিহাস বাঙালির ভাষার কাছে এক মহান প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ভাষার যে লোকাল স্বভাব, আজকের ইংরেজি ভাষা তার চূড়ান্তে পৌঁছে গেছে। আর যত ভাষা, তারাও তাদের লোকাল স্বভাবের সাধনা করে চলেছে; করে চলেছে বাংলাভাষাও। কিন্তু মানুষের

ভাষার যা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণ, যাকে আমরা ভাষার গ্লোবাল স্বভাবের কারণ বলতে পারি, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা তা হারিয়ে ফেললেও, বাঙালির ভাষা আজও তা ধারণ করে রেখেছে; নিজেদের অজান্তেই।

এদিকে মানুষের সমাজের ইতিহাসে একদিকে এখন প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার ডাক শোনা যাচ্ছে, এবং অন্যদিকে লোকাল ও গ্লোবাল উভয় স্বভাবের 'সমুচ্চয়'-এর সাধনা শুরু হয়েছে। মানুষের ভাষার কাছেও প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার এবং লোকাল-গ্লোবাল উভয় স্বভাবকে উচ্চে তুলে ধরার আহ্বান আসছে। মানুষের ভাষা সে-আহ্বানে সাড়া দেবে কেমন করে! তার হাতে রয়েছে কেবল লোকাল স্বভাবের সাধনালব্ধ ফল। ভাষার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণ ও গ্লোবাল স্বভাবের সাধনালব্ধ ফল তো নেই! তা যদি সামান্য পরিমাণেও থেকে থাকে, রয়েছে একমাত্র বাংলাভাষীদের হাতে, বাংলাভাষার হাতে; এবং খানিকটা তাদের অজ্ঞাতসারেই। বাংলাভাষার ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবই ভাষার গ্লোবাল স্বভাব, তার পেছনেই রয়েছে ভাষার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণ। মানুষের ইতিহাস আজ তারই মুখাপেক্ষী। কবে আমরা তাকে সচেতনভাবে উদ্ধার করে, আপডেট করে, বিশ্বমানবের হাতে তুলে দিতে পারব, মানুষের ভাষার ইতিহাসের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব; আমি জানি না।

প্রত্যেক বাংলাভাষীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, নিজেদের সম্পদ-উদ্ধারে হাত লাগান। পৃথিবী আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

টীকা ও টুকিটাকি :

১. হাইলাকান্দি, আসামের শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলাভাষার তৃতীয় ভুবন নামে শনাক্ত করেন। মনে রাখা দরকার, তাঁদের মোট চোদ্দো জন তরুণ-তরুণী (১৯৬১ সালের ১৯ মে, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট ও ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে) বাংলাভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন।

২. উত্তরাধিকার বলতে বাংলাভাষার এযাবৎ অর্জিত সম্পদের ধারণ ও বহন করে নিয়ে চলার অধিকার ও দক্ষিণাধিকার বলতে বাংলাভাষার ভবিষ্যতের অর্জনের অধিকার, সৃজনের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে।

৩. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'লেনিন শতাব্দী' শীর্ষক রচনার একটি অংশ মনে পড়ে গেল–'আজন্ম ধ্রুপদী সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের শুদ্ধ রুচিতে গঠিত লেনিন তাই বিপ্লব-পরবর্তী সমস্ত হঠকারিতার সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন–প্রলেতারীয় সংস্কৃতি কোনও ভুঁইফোড় বস্তু নয়, একমাত্র বেজন্মাদেরই ঐতিহ্য বলে কিছু থাকে না। .. ।'

৪. বলে রাখা যাক, আমার আলোচ্য নিবন্ধটি কলকাতার 'এবং' ও ঢাকার 'আবহমান' দুটি পত্রিকায় যুগপৎ প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল। 'এবং' পত্রিকায় নিবন্ধটি পড়ে কলকাতার কয়েকজন পাঠক আমার সঙ্গে দেখা করেন, ও বিষয়টি নিয়ে বহু আলোচনা করেন। সেই আলোচনার সারবস্তু সম্প্রতি কলকাতার 'এবং' পত্রিকার ২০০৫ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৫. আমার লেখা 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' গ্রন্থে এই ইতিহাস আমি বর্ণনা করেছি। আমার অন্যান্য গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এরকম নানা তথ্য রয়েছে।

৬. ভারতের ইতিহাসের কালবিভাজন এইরকম–সনাতন যুগ, বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, ব্রিটিশ যুগ, স্বাধীন যুগ। এই সনাতন যুগটিকে অনেকে তেমন নজর করেননি। হরপ্পা-মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতা এই সনাতন যুগের। এতে অস্ত্রাগার নেই। এই সনাতন ধর্মের বহু উত্তরাধিকার মানুষের স্বভাবের মধ্যে এখনও থেকে গেছে। যেমন, ক্ষুধার্ত যদি শিশু ও বৃদ্ধ হয়, নিজে না-খেয়েও তাকে দিয়ে দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা... ইত্যাদি। হরপ্পা-মহেঞ্জদাড়োর 'নগরকেন্দ্রিক' সভ্যতা ভেঙে পড়ার ও বৈদিক সভ্যতার

সূত্রপাতের কালেই এই সনাতন সভ্যতার বহু জনগোষ্ঠী বৈদিক সভ্যতার এলাকা থেকে পাহাড়ে-জঙ্গলে বা আবাসযোগ্য অগম্য দেশে চলে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। এ-বিষয়ের বিবরণ কমবেশি আমার উপরোক্ত 'মৌলবিবাদ ...' গ্রন্থে রয়েছে।

৭. আমার 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থটির পাতায় পাতায় এই সম্পদের বিবরণ আমি দিয়েছি। লেখকের অন্য গ্রন্থগুলিতেও ঐ সম্পদের বিশেষ বিশেষ অংশের কথা রয়েছে।

৮. লালন ফকিরের গানের একটি কলি/ 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা'–শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ২০১।

৯. নজরুলের সব ভালো, শুধু তাঁর ঐ শ্যামাসঙ্গীতগুলি ছাড়া। বাংলাদেশ যে-নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে, তাঁকে অনেকেই 'নজরুল-মাইনাস-শ্যামাসঙ্গীত' রূপে দেখেন। এ-ও সেই একই প্রবণতার ফল। আজ আমি জানি নজরুল যদি শ্যামাসঙ্গীত না লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ যদি ব্রহ্মসঙ্গীত না লিখতেন উভয়েই সম্পূর্ণ 'কবি' হতে পারতেন না। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে আমার 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' নিবন্ধে। আগ্রহী পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন।

১০. উপরোক্ত ৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১১. মানুষের ধর্মের সেই বৈজ্ঞানিক স্বরূপের কিয়দংশের সংবাদ আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমার 'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ'-নামক নিবন্ধে। নিবন্ধটি কলকাতার 'রবীন্দ্রনাথ' পত্রিকার ১৬ নম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অচিরে তা গ্রন্থাকারেও পাওয়া যাবে।

১২. আরকুম-এর গানের একটি কলি/ শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত, সং ১৭১, পৃ. ১৩৯; হকিকতে সিতারা, পৃ. ১২/ 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা'–শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ. ৩২।

১৩. একটি তত্ত্বের মানে না বোঝা, তার প্রয়োগ না জানা, কিন্তু তত্ত্বটি আওড়ানো–একেই বোধহয় 'বুকনি ঝাড়া' বলে। এখানে মান্যবর মঈন চৌধুরী অন্য কারও লেখা পড়ে, না বুঝে বুকনি ঝেড়েছেন। 'দেশকালকে গ্রাহ্য করে, বাক্যগঠনের ওপর নির্ভর করে একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যোগান দিয়ে থাকে।' এই বাক্যটি তিনি লিখেছেন, না-বুঝেই লিখেছেন। বুঝলে, 'আঁচ' শব্দের ভিন্ন অর্থটি (উনুন) তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারতেন; কারণ আমার নিবন্ধে 'আঁচ' শব্দটি 'দেশকালকে গ্রাহ্য করে বাক্যগঠনের ওপর নির্ভর করে' ভিন্ন অর্থ যোগান দিয়েছিল। (কবিরা সাধারণত তা-ই করে থাকেন, শব্দের ভিন্ন অর্থ যোগান দেন। তারই জন্যেই তো শব্দের 'অভিধা', 'লক্ষণা', 'ব্যাঞ্জনা' এই তিন প্রকারে অর্থ-নিষ্কাশনের উপায় রয়েছে আমাদের ভাষায়। বিষয়টি আমার 'দিশা থেকে বিদিশায়' গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় 'অর্থ থেকে পরামার্থ' নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) পশ্চিমবাংলায় কেবলমাত্র 'তাপ' অর্থেই নয়, 'উনুন' অর্থেও 'আঁচ' শব্দটির ব্যবহার চলে। নিবন্ধের শিরোনামে 'আগুন ফেলে আঁচ' কথাটি থাকলেও, পশ্চিমবাংলায় প্রচলিত সুখ্যাত একটি আধুনিক গানের প্রথম কলির পুরোটাই নিবন্ধের ভিতরে দেওয়া ছিল–'হীরে ফেলে কাঁচ, আগুন ফেলে আঁচ!' সঙ্গে ছিল প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাও। অর্থাৎ বানানসংস্কারকেরা বাংলাভাষার বানান সংস্কার করতে গিয়ে হীরা ফেলে কাঁচ তুলে নিচ্ছেন, আগুন ফেলে দিয়ে উনুনটাকে সম্বল করছেন! এই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার কথা বোঝাতেই নিবন্ধের শিরোনামায় দুটি (!?) চিহ্নই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মান্যবর মঈন চৌধুরী নিবন্ধের শেষাংশে যখন লেখেন, "আমাদের ভাষার অন্তরে জ্বলছে আগুন, আমরা টের পাচ্ছি আগুনের আঁচ। ভাষার এই 'আগুন' ও 'আঁচ' গ্রাহ্য করেই আমাদের ভাষাসংস্কার কিংবা বানান-সংস্কার করতে হবে ..." তখন বোঝা যায় চৌধুরীসাহেব বাংলাভাষার ভেতরে আগুন যে কোথায় তা তো একেবারেই বোঝেননি, আর কেবলমাত্র 'তাপ' অর্থেই 'আঁচ' শব্দটির অর্থ বুঝেছেন। অর্থাৎ নিবন্ধের নামটাই তিনি ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেননি। এ তো বিসমিল্লায় গলদ হয়ে গেল!

১৪. সমাজ যখন আদিম সাম্যবাদী, মানুষের জগদ্দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি তখন অখণ্ডবাদী; আর সমাজ যখন পণ্যবাহী, মানুষের জগদ্দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি তখন খণ্ডবাদী। খণ্ডবাদী দর্শন জগৎকে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় স্থির সত্তা রূপেই দ্যাখে। বিষয়টি লেখকের 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৫. 'ততঃ কিম', রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫ ।
১৬. 'হিং টিং ছট', রবীন্দ্রনাথ ।
১৭. পূর্বোক্ত 'বাংলা বানান, বাংলা ভাষা' গ্রন্থে শ্রীযুত রবি চক্রবর্তী তাঁর লেখায় বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । পৃ. ৭২ ।
১৮. ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো শব্দই বাঙালি আর বানাতে পারে না, এমন নয় । এখনও বানায়, কম বানায় এবং বানালেও সবসময় তা আমাদের চোখে পড়ে না । 'ভালোবাসা' শব্দটির কথাই ধরুন-না কেন । যতদূর জানি এ-শব্দ কৃত্তিবাস-কাশীরামে নেই, বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই; বহু প্রেমের কথা থাকা সত্ত্বেও । এরকম বেশ কিছু শব্দ বাঙালি পরে বানিয়েছে । কিন্তু কত গভীর সে সকল শব্দ, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি 'বাংলাভাষা : সাতরাজার ধন মানিক আছে যেখানে' নিবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার মীজানুর রহমানের সাময়িক কলকাতা অবস্থানকালে (২০০৫-এর জুন-জুলাই মাসে) প্রকাশিত 'ক্ষণিকা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ।
১৯. এ যে একরকম ছলনা বা আত্মপ্রতারণা, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি বিস্তারিত করেছেন রবি চক্রবর্তী তাঁর উপরোক্ত রচনায় (১৭ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য) । পৃ. ৬৮ ।
২০. পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন (নবম অধ্যায়, ভুবনগাঁয়ে ভাষাযুদ্ধ), কলিম খান ।

ম ঈ ন চৌ ধু রী

শুনিলাম পরিচিতের কথা...

প্রসঙ্গ

সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা করার অধিকার সব পাঠকের আছে, এমন একটি ধারণা পোষণ করেই আমি আবহমান পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কলিম খানের 'বাংলাভাষার বানান সংস্কার : আগুন ফেলে আঁচ!?' শিরোনামে লেখা প্রবন্ধটির একটি প্রতিক্রিয়া লিখেছিলাম এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় । কোনো-এক অজানা/অচেনা 'মান্যবর মঈন চৌধুরী'র প্রতিক্রিয়াটি কলিম খান খুব সহজে মেনে নিতে পারেননি, আর এ-কারণে কঠিনতম, কঠিনতর, কঠিন, সহজ, সহজতর ও সহজতম ভাষায় তিনি 'আনিলাম অপরিচিতের নাম...' শিরোনামে একটি প্রতিক্রিয়া লিখেছেন এবং লেখাটি ছাপা হয়েছে আবহমান পত্রিকার প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় । তার 'প্রতিক্রিয়া'টি যে সাহিত্য আলোচনা-সমালোচনার গণ্ডি পেরিয়ে 'মান্যবর মঈন চৌধুরীকে আক্রমণ' পর্যায়ে চলে গেছে তা বোঝা যায় কলিম খানের লিখিত বক্তব্য পড়লে । কলিম বিষণ্নচিত্তে লিখেছেন :

নিবন্ধের শুরুতে তিনি যে বলেছিলেন তিনি নিজের 'জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য' বা 'নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্য'ই নিবন্ধটি লিখেছেন, সেকথা সত্যি নয়। তবে তিনি ভান করেছেন, এমন কথা ভাবতেও আমার ভালো লাগছে না। যাই হোক, বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষদের বা 'বাংলাদেশের মনীষা'কে আমি যতটুকু বুঝেছি, যতটুকু জানি, মান্যবর মঈন চৌধুরীর নিবন্ধে সে-মনীষার সাক্ষাৎ মেলে না। 'বাংলাদেশের মনীষা'র প্রতিক্রিয়া কেন আমি পেলাম না, এ-দুঃখ আমার থেকেই গেল। এবং অভিমানও।

বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কেন যে কলিম খান-এর প্রবন্ধের লিখিত পজেটিভ প্রতিক্রিয়া জানাল না, কেন তাকে অভিমানী করে তুলল্তএমন সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে আমার লেখাটি ছিল একজন সাধারণ পাঠকের 'পাঠ প্রতিক্রিয়া', যা সমালোচনা-সাহিত্যের উপাদান। 'যা ইচ্ছে তাই লিখে' কলিম খানের মনকে বিষণ্ন করে তোলা কিংবা তাকে অভিমানী বানানোর ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে এ-বিষয়ে আমার একটি বিনীত বক্তব্য আছে। কলিম খান যদি সত্যি ভাবতেন যে 'মান্যবার মঈন চৌধুরী'র প্রতিক্রিয়া লেখার ক্ষমতা নেই, মনীষা নেই, তবে তিনি প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া না-লিখে চুপ থাকলেই পারতেন। তিনি তার প্রতিক্রিয়া লিখে একজন অখ্যাত 'মঈন চৌধুরী'র মূল্যায়ন করেছেন অযথাই।

কলিম খান তার সমালোচনা-প্রবন্ধটি ভাগ করেছেন বিভিন্ন কাব্যিক উপ-শিরোনামে। প্রবন্ধে কাব্য চলে আসায় আমি হয়তো সবগুলো উপ-শিরোনামের নান্দনিক ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারিনি, তবু আমার প্রতিক্রিয়ায় তার লেখা উপ-শিরোনামগুলোই ব্যবহার করছি পাঠ-বিভাজক হিসেবে।

দুই.

বাংলাভাষার পঞ্চভুবন

বাংলাভাষার পঞ্চভুবন হিসেবে কলিম খান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের জগৎ, বাংলাদেশের বাঙালিদের জগৎ, উত্তর-পূর্বভারতের বাঙালিদের জগৎ, ভারতের বাকি অংশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা যথেষ্টসংখ্যক বাঙালিদের জগতকে চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় কথা বলে, বাঙালি বা বঙ্গাল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, এমন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে 'পঞ্চভুবন'-প্রকল্প দাঁড় করানো আমার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত বাংলাভাষী জনগণ নিয়ে একটাই মাত্র ভুবন আছে, আর এই ভুবনকে আমরা শুধুমাত্র বাংলাভাষার ভুবনই বলতে পারি। কলিম উল্লিখিত পাঁচটি বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাংলাভাষার ভুবনে'র অংশ এবং বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলগুলোর সমস্যাও বিভিন্ন মাত্রার।

শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা অনেকটা এগিয়ে ছিল এবং এখনো আছে। তাদের এই এগিয়ে থাকার প্রেক্ষাপটে আছে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ। বাদশাহি আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন-আমলে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশ্রেণীর লোকজন তৎকালীন সরকারের আস্থাভাজন থেকে শিক্ষাদীক্ষায় এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব যে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকজনকে কেন্দ্র করেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকেই সে-সময় আধুনিক বাংলাভাষার গোড়াপত্তন করেছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীভুক্ত বাঙালি জ্ঞানীগুণীজন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাকেন্দ্রিক মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের-বিকাশও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য যথেষ্ট অনুকূল ছিল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ধারাবাহিকতা এখনো বজায় আছে এবং আমরা যৌক্তিকভাবেই চিন্তা করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিকাশের জন্য এখনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাভাষার ভুবনের অংশ হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারত পশ্চিমবঙ্গের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কখনো পায়নি এবং এর ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এ-অঞ্চলগুলোতে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সেসব বাংলাভাষী লোকজন স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, তাদের মাঝে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি কতদিন টিকে থাকবে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আগামী দু-এক প্রজন্মের পর তারা আর বাংলাভাষায় কথা বলবেন, বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা করবেন (শুধুমাত্র দুর্গাপুজো ছাড়া), এমন চিন্তা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাইরে বিদেশে যেসব বাংলাভাষার জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তারাও বাংলাভাষার জগৎ ছেড়ে স্থানীয় মূলধারায় বিলীন হয়ে যাবেন এমন যৌক্তিক চিন্তা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিকাশের অন্তরায় হল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ভারত হল এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ভাষার ও সংস্কৃতির লোকজন সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় একত্রে বসবাস করছে এবং এ-কারণে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কোনো অবস্থাতেই আঞ্চলিকভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবোধ জাগুক, তা চাচ্ছে না। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মূলনীতি হল হিন্দি ও ইংরেজিভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। হিন্দি ও ইংরেজি সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি করছে বলিউডের ফিল্ম, চটুল হিন্দি সংগীত এবং জিটিভি, স্টার টিভি, সাহারা টিভি, সনি টিভি, স্টার প্লাস ইত্যাদি নামের ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো। সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভাষা হিসেবে ইতোমধ্যেই ইংরেজিভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাভাষা হেরে যাচ্ছে 'ইং-হিন্দ'-মার্কা ইংরেজিভাষার কাছে। এমন একটা অবস্থা থেকে কীভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করা সম্ভব, তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী জনসাধারণকে।

পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান কিংবা বর্তমানের বাংলাদেশে অবস্থানরত বাঙালি বা বঙ্গাল জনগণের মাঝে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ পশ্চিমবঙ্গের সমান্তরালে হয়নি বিভিন্ন কারণে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই আধুনিক পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে পরিহার করেছিলেন এবং এর ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হননি। দেশবিভাগের পরে পূর্বপাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর

ওপর পাকিস্তানি 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল তৎকালীন পাকিস্তান-সরকার এবং এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে এদেশের বঙ্গালরা মাতৃভাষা বাংলা করার দাবিতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনি। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বা পূর্বপাকিস্তানে অবস্থানরত উচ্চশ্রেণীর ও শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এদেশে থাকলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঠিকানা ছিল কলকাতাসহ পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এবং এই শিক্ষিত হিন্দুজনগোষ্ঠী দেশবিভাগের সাথে-সাথে পশ্চিমবঙ্গের তাদের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুলেছিলেন।

ফলে, বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও যোগ্য জ্ঞানীগুণীজন ও মনীষার অভাব তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ছিল প্রচণ্ডভাবে। শত-সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অবস্থানরত মুসলিম ও হিন্দু জ্ঞানীগুণীজন ও সাধারণ মানুষ বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই একসময় স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এখানে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে এবং আমরা আশা করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণীজন, সৃষ্টিশীল কবি ও লেখক এবং সংস্কৃতিসেবীরা আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ আশাব্যঞ্জক হলেও, প্রধান সমস্যা হিসেবে Cultural Aggression বা Cultural Inperialism-কে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ও ইংরেজিভাষার প্রচার ও প্রসার যেভাবে করছে এবং এই কাজে মুম্বাইয়ের ফিল্ম, সংগীত ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে-অবদান রাখছে, তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশও আক্রান্ত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। আজ থেকে দশ বছর আগেও বাংলাদেশের মানুষ বাংলাভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অল্পসল্প ইংরেজি চর্চা করত (ইংরেজি-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস ও শিক্ষিত লোকজনের মাঝে)। এই নিবন্ধের লেখক কর্তৃক পরিচালিত এক সীমিতমাত্রার জরিপে দেখা যাচ্ছে যে এখন বাংলাদেশের লোকজনের প্রায় তিরিশ শতাংশ হিন্দিভাষা বোঝে, আর এটা সম্ভব হয়েছে ভারতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর হিন্দি ছায়াছবির কল্যাণে।

এমন অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও 'বাং-হিন্দ'-নামক এক নতুন উপভাষার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং হিন্দিফিল্ম বাংলাদেশের মানুষের পাঠাভ্যাসকেও নষ্ট করে ফেলছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের লোকজন এখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না পড়ে দেখছে মুম্বাই-এর দেবদাস আর পরিণীতা, তাদের মাঝে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর মুম্বাইয়ের ফিল্মের মাধ্যমে ঢুকে যাচ্ছে 'ইং-হিন্দ'-মার্কা অপসংস্কৃতি। এমন একটা অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে হলে সরকারের উচিত ভারতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচার সীমাবদ্ধ করা এবং হিন্দিফিল্মের বাজারকেও নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মাঝে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময় আরও অনেক বাড়াতে হবে এবং এ-কাজটি করেই আমরা মহান ২১ ফেব্রুয়ারির চেতনাকে সংরক্ষণ করতে পারি, বাংলাভাষাকেও রক্ষা করতে পারি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাত থেকে।

কলিম খান 'বাংলা বানা সংস্কার' নিয়ে লিখতে গিয়ে সংস্কৃতভাষাকে বানিয়েছিলেন শাশুড়ি আর বাংলাভাষাকে বউমা (অবশ্য পরবর্তী প্রবন্ধে তিনি তার ভুল শুধরে নিয়েছেন)। কিন্তু 'বাংলাভাষার পঞ্চভুবন' লিখতে গিয়ে তিনি আবারও একইরকম ভুল করে বসেছেন। এবার তিনি এনেছেন 'বাংলাভাষা সংস্কার-এর কর্তা', 'অন্য ভুবনের ভাইদের প্রতি কর্তব্য', 'দাদাগিরি', 'বাংলাভাষার পতাকার বাহক' ইত্যাদির মতো অধিবিদ্যাজাত (metaphysical) সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কের কর্মপদ্ধতিকে। একটি যৌক্তিক প্রবন্ধে এমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়তো-বা যুক্তিসঙ্গত নয়।

তিন.

যে কথা তুমি বলিতে চাও, সে কথা তুমি বল না

কলিম খান তার নিবন্ধের এই পর্যায়ে এসে 'মান্যবর মঈন চৌধুরী' যা বলতে চেয়েও বলেননি তা আবিষ্কার করেছেন এবং কঠিনতম ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। কলিম খান কেন যে সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনায় এতটা কঠিন হন, তা আমি এখন বুঝতে পারি। তিনি যে অতিমাত্রায় ইমোশনাল ও সেন্টিমেন্টাল, তা আমি দেখেছি ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এক আলোচনা সভায়। ঐ সভায় যখন এক শ্রোতা হঠাৎ বলে বসলেন 'কলিম সাহেব, আপনার পরমতত্ত্ব তো বাংলাভাষার বারোটা বাজাবে' তখন কলিম খান প্রথমে রাগে-অভিমানে প্রায় কেঁদে ফেললেন এবং পরে একসময় বললেন 'বাংলাদেশে এসে আমাকে কাঁদতে হল!?' আমি জানি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা কিছুটা সেন্টিমেন্টাল হতে পারে, কিন্তু একজন প্রাবন্ধিক, যিনি যুক্তি নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, তার মনে হয় এতটা ইমোশনাল/সেন্টিমেন্টাল হওয়া সাজে না। কলিম খান তার বক্তব্যের এই পর্যায়ে এসে লিখেছেন :

> না, মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাদের 'বেজন্মা' ভাবেননি। তিনি বিশ্বাস করেন আমাদের বাপ-পিতামহ ছিল, পিতৃমাতৃপরিচয় ছিল, আমরা একেবারে অনাথ নই; তাই তিনি বলেছেন আমাদেরও 'ঐতিহ্য-ইতিহাস' এবং 'প্রকৃত ইতিহাস' রয়েছে। কিন্তু কোথায় রয়েছে? তিনি সাহস করে বলেছেন যে, 'মক্কা-মদিনা'য় নেই। ভালো কথা? তা হলে কোথায় রয়েছে? (না, পরম্পরাগতভাবে প্রবহমান আমাদের লিখিত প্রাচীন সাহিত্যের শত শত প্রাচীন গ্রন্থসম্ভারেও নেই, অর্থাৎ বেদ উপনিষদ সাংখ্য মীমাংসা বেদান্ত যোগ তন্ত্র পুরাণ সংহিতা রামায়ণ মহাভারত যাস্ক পাণিনি ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস কাশীরাম কৃত্তিবাস কিংবা বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রসমূহ, কৌটিল্যে, চরক-শুশ্রুতে অথবা আমাদের বহুকালক্রমাগত শাস্ত্রীয় নৃত্য বাদ্য সংগীত আচার অনুষ্ঠান... ইত্যাদি ইত্যাদিতে নেই, এই 'প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার' ফেলে দিতে হবে—এটিই তাঁর না-বলা অস্পষ্ট কথা। তিনি বলেছেন, সে-ইতিহাস) রয়েছে 'বঙ্গ-দেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে।' কীভাবে রয়েছে? মাটিচাপা পড়ে? না, জনপদগুলোর মাটি খুঁড়ে ফেলতেও তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের শেকড় খুঁজতে ভাষা ও সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ আরও জোরে চালাতে হবে...।' কিন্তু ভাষার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ, সমাজের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ কী রকম কাজ? সে-কাজ কেউ কি করেছেন? কীভাবে করতে হয়, না, এসব বিষয়েও তিনি আমাদের কিছুই বলেননি। তা হলে তিনি কী বলতে চান?

কলিম ঠিকই বলেছেন, আমি কখনো কাউকেই 'বেজন্মা' ভাবি না, এমনকি 'বেজন্মা' শব্দটি যে সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনায় ব্যবহার করা যায় তাও কখনো ভাবিনি। কলিম খানের বক্তব্য পড়ে আমার মনে হয়েছে তিনি একটি অভিধান খুলে 'প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের' অর্থ উদ্ধার করে তা প্রয়োগ করেছেন আমার বক্তব্যে। আমি কিন্তু আমার বক্তব্যে বঙ্গদেশের আদি জনপদগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার কথাই বলেছিলাম, কারণ আমি মনে করি বাংলাভাষায় যারা কথা বলেন এবং যারা নিজেদের বাঙালি/বঙ্গাল হিসেবে দাবি করেন, তাদের আসল ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিকড়, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বঙ্গদেশে বসবাসকারী আদিম বঙ্গালসমাজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। বঙ্গদেশের আদি বঙ্গালসমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে নৃতাত্ত্বিক/প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনেকেই করেছেন এবং এখনো করছেন। এ-প্রসঙ্গে আমি কলিম খানকে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস্তআদিপর্ব', অতুল সুরের 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', সুকুমার সেন-এর 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ইত্যাদি শিরোনামের বইগুলো প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার জন্য পড়ে নিতে বলব।

আমার শিকড়, ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষ ও সমাজ সম্পর্কে আমি কী ভাবি ও বুঝি, তা নিয়ে এ-পর্যায়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে বসবাস করত প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বঙ্গাল কৌমসমাজের লোক। পরবর্তী পর্যায়ে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে বঙ্গদেশে এবং আদি-অস্ত্রালজনগোষ্ঠীর সাথে একাকার হয়ে বঙ্গাল হিসেবেই বসবাস করতে থাকে বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপি, সুহ্ম রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র ইত্যাদি নামের বঙ্গদেশের আদি রাজ্য সীমানাগুলোতে। একসময় দক্ষিণ ইউরোপীয় আলপীয় ইউরোপয়েড মহাজাতির জনগোষ্ঠী বঙ্গদেশে জনপদ গড়ে তোলে এবং প্রাক-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশেমিশে সৃষ্টি করে এক মিশ্র বঙ্গালজাতিসত্তার। এই মিশ্র বঙ্গালজাতিসত্তা লৌকিকধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের ভাষাকাঠামোর বির্বতন হয়েছিল অস্ত্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয় ভাষার সংমিশ্রণের ফলে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম কৌমভিত্তিক লৌকিকধর্মের সাথে সহাবস্থান করছিল এবং একসময় বঙ্গালজাতিসত্তায় মোঙ্গলয়েড উপাদানও যুক্ত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সময় আদি বঙ্গাল কৌমের দেবী বজ্রযানী এবং দেবী জাঙ্গলী বৌদ্ধ দেবী হিসেবেই পুজো পেত এবং এ থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও কৌমধর্ম কোনোরকম বিরোধ ছাড়াই সহাবস্থান করত। গুপ্ত যুগে বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে বর্মণ, সেন ও দেব পর্বের নরপতিগণের সহযোগিতায় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য পেতে থাকে এবং সত্য বলতে গেলে জাতপাতকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতার বীজবপন হয় তখনি। আমরা যদি বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির মতো গ্রন্থগুলো পড়ি তবে জাতপাতকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক উপাদান খুঁজে পাব।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ মুসলিম শাসনের পত্তন হয় এবং ১৭৫৭ সাল নাগাদ বঙ্গদেশের প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে যায়। অল্প কিছুসংখ্যক বহিরাগত মুসলিম ছাড়া বঙ্গদেশের বেশিরভাগ মুসলিম ছিল হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম থেকে আসা ধর্মান্তরিত মুসলিম। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশের নবাবদের পরাজিত করে কোম্পানির তথা ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম করে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গদেশের এক অংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অন্য

অংশ পূর্বপাকিস্তান নামে হয়ে যায় এক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ। ১৯৭১ সালে এক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদশে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং এই বাংলাদেশই হল বাংলাভাষী শাসিত প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র।

আমি খুব সংক্ষেপে যে-ইতিহাস তুলে ধরলাম তা-ই হল বঙ্গদেশের বাঙালি বা বঙ্গালের সামাজিক/নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। আমরা যদি আমাদের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব যে আমাদের সামাজিক/নৃতাত্ত্বিক শিকড় বঙ্গদেশের প্রাচীন কৌমসমাজ ও কৌমসমাজের বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করেই এগিয়ে গেছে। সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক শিকড় সন্ধান করতে গেলে কোনো অবস্থাতেই তাই বাইরের কোনো ভৌগোলিক স্থানকে বিবেচনায় আনা যাবে না।

আমরা জানি যে, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয় সামাজিক/নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে যে আদি/অস্ত্রাল কৌমসমাজের লোকজন বসবাস করত তাদের নিজস্ব ভাষা নিশ্চয়ই ছিল এবং তা দ্রাবিড়, আলপীয় ও মোঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠীর ভাষা আত্মস্থ করেই বিবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে আদি কৌমভাষার সাথে সংস্কৃতভাষা যুক্ত হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আরও পরে আরবি, ফারসি ও ইংরেজিভাষা বাংলাভাষাকে আরও আধুনিক ও উন্নত করে তুলেছে। বাংলাভাষার উন্নয়নের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি ঋণী সংস্কৃতভাষার কাছে, কারণ সংস্কৃতভাষার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মূলশব্দ বা অপভ্রংশ বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাভাষার উপাদান হিসেবেই। বাংলাভাষায় যে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ ও অন্যান্য বিদেশি শব্দ রয়েছে, সেগুলো এখন বাংলাভাষার সম্পদ, শব্দগুলোকে আমরা বাংলাই বলব।

বঙ্গদেশের নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক ইতিহাস এবং সামাজিকভাষার উৎস ও বিবর্তন খুঁজতে হলে আমাদের প্রাচীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ, জীবন ও ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আমি এমন একটি কাজকেই বলেছিলাম 'প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ' আর আমি এ-বাক্যটি ব্যবহার করেছিলাম মিশেল ফুকোর Archeology of Knowledge-এর ধারণাকে আত্মস্থ করে। কলিম খান আমার বক্তব্যকে খুব সরল অর্থে বিশ্লেষণ করে আমাকে বানিয়েছেন একজন সাম্প্রদায়িক মুসলমান। বাংলাদেশে আমি ভালো মুসলমান নই, আমি অসাম্প্রদায়িকএমন চরিত্র নিয়েই অবস্থান করছি, কিন্তু কলিম তার কলমের খোঁচায় আমাকে একজন ভালো সাম্প্রদায়িক মুসলমান বানিয়ে ছাড়লেন! এ-প্রসঙ্গে আমি স্বীকার করব যে বাংলাদেশে অবশ্যই কিছুসংখ্যক মুসলমান আছেন যারা সংস্কৃত-ভাষাকেন্দ্রিক বাংলাভাষার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে চান। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঐসব খাঁটি মুসলমানের (?) দলে নই এবং এ-কারণে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, দিঙনাগ, বাদরায়ন, মনমিশ্র, নাগেশ ভট্ট প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আমি অনেক করেছি। পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দার্শনিকরা যে-প্রাচীন ভারতীয় ভাষাদর্শন থেকে বিভিন্ন ধারণা/বক্তব্য ধার করেছিল তা আমি লিখেছি 'সস্যুর, দেরিদা ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন'-নামক প্রবন্ধে। আমি বেশ ভালো করেই বুঝি যে Stcherbatsky রচিত Buddhist logic (Dover Publication, Inc, New York, 1962) গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্যের ভাষাদর্শনে আলোড়ন তুলেছিল এবং অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রন্থটি থেকে অনেক ধারণা/চিন্তার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু শুধুমাত্র এ-কারণে বঙ্গদেশের লোকজনের নৃতাত্ত্বিক/সামাজিক শিকড় ও ঐতিহ্য উত্তরভারত, অযোধ্যা কিংবা লঙ্কাতে চলে যাবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই আমি বলেছিলাম, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস' এই বাক্যের সাথে আমি একমত নই।" আমি আরও বলেছিলাম "বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাসও 'মক্কা-মদিনায়' নেই।" বাংলাভাষার ঐতিহ্য-ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সব আঞ্চলিকভাষার উপাদানসমূহকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দেখতে হবে মান-বাংলাভাষায় ঐসব আঞ্চলিকভাষার কী অবদান রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে আমি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষাকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন শবদেহ ছিন্ন করেন, সেইরূপে ভাষার দেহ ছিন্ন করিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন অনুবীক্ষণযোগে প্রত্যেক কোষকে পরীক্ষা করেন, সেইরূপ যুক্তির অনুবীক্ষণযোগে প্রত্যেক শব্দকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন শব্দকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শরীরতত্ত্ববিৎ কোন অঙ্গ পরিহার করেন না। সেইরূপ এ শব্দটা slang, এটা প্রাদেশিক, এটা অকিঞ্চিৎকর, এই বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বলে না। তত্ত্বান্বেষীর নিকট কিছুই অবহেলার বিষয় নহে; কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। ধূলিকণায় যে তত্ত্ব নিহিত আছে, সৌরজগতের তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর না হইতেও পারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতির সহিত বাঙ্গালার তুলনা করিতে হইবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা-সমুদয় পরস্পর তুলনা করিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের প্রচলন পরীক্ষা করিতে হইবে। ধাঙ্গড়ের ভাষা, সাঁওতালের ভাষা, কোল দ্রাবিড় ভুটিয়ার ভাষা খুঁজিতে হইবে; কে বলিতে পারে, ঐ সকল ভাষার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ কি; কে জানে, উহাদের কাছে বাঙ্গালার কতটা ঋণ আছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান সংকলিত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে আঞ্চলিক অনেক শব্দই মান-বাংলাভাষায় অবস্থান করে নিয়েছে। আমাদের ভাষা নিয়ে আরও বিস্তারিত 'প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা' প্রয়োজন, এ-বিষয়টি বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিকরা বোঝেন, আমি নিজেও তা মনে করি এবং আশা করি কলিম খানও বিষয়টিকে অবহেলা করে শুধুমাত্র রামায়ণ-মহাভারতে ঘুরপাক খাবেন না।

চার.

হারালে চায় পেলে নেয় না ভব জীবের ভ্রান্তি যায় না

'মান্যবর মঈন চৌধুরী' একজন মানুষ নামের জীব এবং এ-কারণেই তার মন, চেতনা, চৈতন্য ইত্যাদি তৈরি হয়েছে বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করেই (এ-মুহূর্তে আমি স্মরণ করছি জাক লাকাঁর দর্শন, আমি বুঝতে পারছি আমার মন, চেতনা, চৈতন্য ইত্যাদি বাংলাভাষায় তৈরি এবং আমি জাক লাকাঁর মতো বলছি : man speaks therefore, but it is because the symbol has made him man)। আমার বাংলাভাষা দিয়েই তৈরি হয়েছে আমার চেতনাকাঠামো

(Paradigm) বা বিশ্ব-চিত্র (আবারও আমি স্মরণ করছি টমাস কুন-এর দর্শনতত্ত্বের বই The Structures of Scientific revolution (1962)-এ উল্লেখিত চেতনাকাঠামো বা Paradigm-এর বিষয়)। ভাষা যেহেতু প্রচণ্ডভাবে বিনির্মাণ (Deconstruction)-এর ব্যাপার এবং Paradigm বা চেতনাকাঠামো যেহেতু যৌক্তিক বিপ্লবের প্রভাবে বিবর্তনযোগ্য, সেহেতু কলিম খান লিখিত বাক্য 'হারালে চায় পেলে নেয় না ভব জীবের ভ্রান্তি যায় না'-কে আমি নিছক অধিতাত্ত্বিক বা metaphysical বাক্য হিসেবেই চিন্তা করছি।

কলিম খান তার নিবন্ধটির এই পর্যায়ে এসে আমার প্রতি কঠোর হয়েছেন, কারণ আমি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস'-এর সাথে একমত পোষণ করিনি। আমি কেন রবীন্দ্রনাথের সাথে একমত হতে পারিনি তা ইতোমধ্যেই লিখেছি এবং এ-ব্যাপারে আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে আমি ভাষাতাত্ত্বিক রোলাঁ বার্থ-এর একটা কথা অবশ্যই কলিম খানকে স্মরণ করিয়ে দেব, আর কথাটি হল : 'Death of an Author'। একজন সৃষ্টিশীল কবি, সাহিত্যিক কিংবা প্রাবন্ধিক তার সাহিত্যকর্মটি রচনা করার পরপরই সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সবধরনের সম্পর্ক চুকে যায়, সাহিত্যকর্মটি হয়ে যায় পাঠক/সমালোচক-এর সম্পত্তি। একজন বোদ্ধা পাঠক কিংবা সমালোচক একটি সাহিত্যকর্মকে বিচার/বিশ্লেষণ/বিনির্মাণ করে স্বাধীনভাবেই তার মতামত দিতে পারেন, এতে স্রষ্টা কিংবা অন্য কারও মান-অভিমান করার সুযোগ নেই। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শেকস্‌পিয়র, দান্তে, ভার্জিল প্রমুখ কেউই ভাগবানের অবতার নন এবং তাদের সৃষ্টি বা বক্তব্যও কোনো অবস্থাতেই বেদবাক্য নয়। যেহেতু সাহিত্য 'বেদবাক্য' নয়, সেহেতু একজন সমালোচক কিংবা একজন পাঠকও সাহিত্যকর্মটি নিয়ে তার নিজস্ব চেতনাকাঠামোগত (paradigmic) বক্তব্য রাখতে পারেন।

কলিম খান রামায়ণ-মহাভারত-কে ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আমরা যদি ক্লদ লেভিস্টাউস, রোলাঁ বার্থ, জ্যাক ইহ্যারমান, জেরার্ড জেনে, রোমান ইয়াকবসন, ডেভিড লজ, ভল্‌দিমির প্রপ, এজে গ্রেইমাস, জাভেতান তোদোরব, জোনাথন কলার প্রমুখ সাহিত্যতাত্ত্বিকের তত্ত্ব দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত বিশ্লেষণ করি, তবে রামায়ণ-মহাভারতের ঃবীঃ-এ মানবিক ভাষাকাঠামোর উপাদান এবং পৌরাণিক ঘটনাবিন্যাস উদ্ধার করতে পারব। আমরা দেখতে পাব যে রাম-রাবণের রামায়ণ এবং কুরু-পাণ্ডবের মহাভারতের সাথে কাঠামোগত মিল রয়েছে 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি'র। রামায়ণ ও মহাভারতে যদি কিছু ঐতিহাসিক উপাদান থেকেও থাকে, তবে তা ব্যাজস্তুতি (irony), আংশিক উপস্থাপন (synecdoche), লক্ষণালঙ্কার (metonymy), অতিশয়োক্তি (hyperbole), রূপকালঙ্কার (metaphor), রূপান্তর (metalepsis) ইত্যাদির প্রভাবে ভীষণভাবে বিনির্মিত এবং এর ফলে রামায়ণ-মহাভারতকে ঠিক ইতিহাস বলা যাবে না। রামায়ণ-মহাভারত থেকে ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য কলিম খান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনস্তত্ত্বের ওপর অনেকটা নির্ভর করেছেন, তিনি লিখেছেন :

> কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে ইতিহাস বলেছিলেন কেন? কারণ, তাঁর অন্তত দুটো সুবিধা ছিল। এক. তাঁর ছিল উপনিষদের পাঠ ও ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে ওঠা, আর ছিল প্রবল অনুভূতিপ্রবণতা, যার জোরে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত অনুভব করে নিতে পেরেছিলেন। তাই বলে সেই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি পৃষ্ঠার অর্থ কিন্তু তিনিও বুঝতে পারেননি। পারলে

রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাসসম্মত অনুবাদ তিনিই করে দিয়ে যেতেন। আজ আমাদের হাতে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি এসে গেছে বলে, তার সাহায্যে সেই ইতিহাসকে বুঝে নিতে পেরেছি বলে, একথা আজ সহজে বলতে পারি যে—রবীন্দ্রনাথের অনুভব-শক্তি সত্যিই অতুলনীয় ছিল। তিনি রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করবার যথার্থ ভাষা না-জেনেই অনেক দূর পর্যন্ত অনুভব করে নিতে পেরেছিলেন। তার জোরেই তিনি ওইরকম কথা বলে যেতে পেরেছিলেন। দুই. তাঁকে ঐতিহাসিকদের মতো তত্ত্ব তথ্য দিয়ে সত্য প্রমাণের পরীক্ষায় বসতে হয়নি। তাঁর মনে যা এসেছে, তা তিনি অনায়াসে বলে যেতে পেরেছিলেন। পরীক্ষায় বসতে হলে এসব কথা তিনি বলে যেতে পারতেন কি না সন্দেহ।

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণ-মহাভারতের প্রতিটি পৃষ্ঠার অর্থ না বুঝেও শুধুমাত্র 'অনুভব-শক্তি' দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতকে ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন"—কলিম খানের এমন মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য ভীষণভাবে অধিতাত্ত্বিক (metaphysical) এবং তা কোনোভাবেই আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষাদর্শন কিংবা ইতিহাসতত্ত্বকে সমর্থন করে না। রামায়ণ-মহাভারতে যদি প্রচ্ছন্নভাবে কোনো ইতিহাস থেকে থাকে তবে তা-ও বঙ্গদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নয়, কারণ যখন রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছিল তখনও বঙ্গদেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস করত। এ প্রসঙ্গে ড. অতুল সুর লিখেছেন :

> কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত রচনার যুগে আমরা বাঙলাদেশের লোকদের প্রতি আর্যদের বিদ্বেষভাব আর লক্ষ্য করি না। মহাভারত রচনার যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। জৈনদের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক আচারাঙ্গ সূত্রে আমরা 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' দেশের নামেরও উল্লেখ পাই। সেখানে রাঢ়দেশের দুই বিভাগের কথা বলা হয়েছে : বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) ও সুব্বভূমি (সুহ্মভূমি)। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহেও আমরা সুহ্মদের উল্লেখ পাই। তা ছাড়া প্রাক-বৌদ্ধ যুগের দুই জনপদের নাম পাই : শিবি ও চেত।

অতুল সুর, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেনসহ বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীজনের ইতিহাসচেতনা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে বঙ্গদেশের বাংলাভাষী জনগণের প্রকৃত ইতিহাস ও শিকড় অবস্থান করছে বঙ্গদেশেই। আমাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিতে হয়তো-বা রামায়ণ, মহাভারত, মক্কা, মদিনা, যুক্তরাজ্য, পর্তুগাল ইত্যাদি-বিষয়ক অনেক উপাদান যুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের গর্বের সাথেই স্মরণ করতে হবে বঙ্গদেশে অবস্থানকারী/বসবাসকারী আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের।

পাঁচ.

আশিক-মাশুক যদি থাকে দুই স্থানে

একটি 'শব্দে'র মাঝেই আমরা এক 'ক্রিয়ারত ক্রিয়াকারীকে দেখি' এবং শব্দের অর্থ উদ্ধার করি, এমন বক্তব্য প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের ভাষাদর্শন/ভাষাতত্ত্ব সমর্থন করে না এবং এ-কারণে আমি এখনো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা কলিম খানের ভাষাদর্শনকে সমর্থন করতে পারছি না। কলিম খান এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন :

আমরা কথা ভুল কি না, সেকথায় আমি পরে আসছি। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভুল কথা বলেছেন—এমন কথা বলার সময় মান্যবর মঈন চৌধুরীর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল, তিনি কী বলছেন। প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব এ-বিষয়ে কী বলে, একবার ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এতকাল ধরে এত বড়ো বড়ো ভাষাতাত্ত্বিক যে বলে গেলেন শব্দ উচ্চারিত হলেই মনশ্চক্ষে তার ছবি ভেসে ওঠে, শব্দের সেই চিত্রগুণের সবটাই বাজে কথা? আমার সাধারণ জ্ঞান কী বলে? সুনীলবাবুর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই, পড়াশুনো নেই, যে তিনি ওরকম বাজে কথা লিখে দিলেন? মান্যবার মঈন চৌধুরীর জানা উচিত সুনীলবাবু কিন্তু একেবারেই বাজে কথা বলেননি। তিনি যা বলেছেন, প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারেই বলেছেন। তাঁর কথাকে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ষোলো আনা সমর্থন করে। 'শব্দের চিত্রগুণ'-এর সেই কথাটি এমনকি বাংলাদেশের অনতিখ্যাত মাসুদ খানও জানেন (যাঁর লেখা 'কবিতা : মানবজাতির মাতৃভাষা' নিবন্ধটি আবহমান-এর ৩য় সংখ্যাতেই বেরিয়েছে)। কিন্তু মান্যবর মঈন চৌধুরী জানেন না! আশ্চর্য!

কবি ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার প্রিয় কবিপুরুষ ও লেখক, তার কবিতা আমাকে কবিতা লিখতে অনুপ্রেরণা জোগায়, সুনীলের 'নীরা' আমার কল্পনার 'পরী', আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সুনীলকে শ্রদ্ধা করার অর্থ এই নয় যে আমি তাকে ভগবানের অবতার ভেবে তার কথাকে বেদবাক্য ভাবব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিটি লেখা, লিখিত বক্তব্য এখন পাঠকের সম্পত্তি, আমার সম্পত্তি এবং এ-কারণেই আমার অধিকার/স্বাধীনতা আছে সুনীলের লেখার/মন্তব্যের যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা করার। একটি 'শব্দ' কিংবা 'শব্দের চিত্রগুণ' কোনো অবস্থাতেই একটি একক 'শব্দে'র মাঝ থেকে বেরিয়ে আসে না। কয়েকটি শব্দ মিলে একটি বাক্য তৈরি হলে, বাক্যস্থিত অন্যান্য শব্দের পরম্পরায় 'শব্দ'টির অর্থ বা 'চিত্রগুণ' উপস্থিত হয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করি। বঙ্গীয় শব্দকোষ (অভিধান) অনুযায়ী 'গরু' শব্দটির অর্থ গোজাতি, বৃষ, গাভী। এখন আমি 'গরু' শব্দটি দিয়ে কিছু বাক্য রচনা করি :

ক) গরু ঘাস খায় (বৃষ ও গাভীর কর্ম)
খ) লোকটা একটা গরু (লোকটা বোকা)
গ) মেয়েটার চোখ গরুর মতো (মেয়েটির চোখ বড়)
ঘ) ঘরটাকে গরুর গোয়াল করে রেখেছ কেন? (ঘরটা ময়লা)
ঙ) গরু দুধ দেয় (গাভীর কর্ম, বৃষের নয়)
চ) তুমি তো একটা কোরবানির গরু (বিপদগ্রস্ত লোক)

উপরিউক্ত ছয়টি বাক্য 'গরু' শব্দটির ছয় রকম অর্থ বা চিত্রগুণ উপস্থিত করছে। 'ক্রিয়ারত ক্রিয়াকারীকে দেখি' কিংবা 'অভিধানে যা আছে তাই হল শব্দের অর্থ' এমন যদি কেউ ভাবেন, তবে তিনি ভাষাঅর্থতত্ত্বের কাছাকাছি অবস্থান করছেন না, এটাই হল আসল সত্য। কলিম খান-এর মন্তব্য পড়ে আমার আরেকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে। তিনি কবি মাসুদ

খানকে বলেছেন 'অনতিখ্যাত'। বাংলাদেশে মাসুদ খান আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি, তাকে 'অনতিখ্যাত' বলার অধিকার কলিম খানকে কে দিল?

'আশিক-মাশুক' পর্যায়ে এসে কলিম খান আরও লিখেছেন :

শব্দের ভিতরে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু পরম্পরাগতভাবে তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা অভিধানে লিখে রাখা থাকে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই অর্থ কখনো কখনো কিছু-কিছু বদলে যায়—একালের ভাষাতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত। এটিকেই আমি বলছি প্রথম তত্ত্ব। একালের পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই শব্দের অর্থারোপ ও অর্থ নিষ্কাশনের এই নিয়ম। শব্দের এক্কেবারে কেনো অর্থই নেই, এটি বাজে কথা। শব্দের কোনো অর্থই যদি না থাকবে সব ভাষার অভিধানগুলো জ্বালিয়ে দিলেই হয়। তা ছাড়া আকাশ নদী হরিণ বললে কার কার কথা বলা হচ্ছে সেটা সবাই বুঝতে পারে। তা হলে 'শব্দের কোনো মানে নেই'—কথাটার কী মানে? হ্যাঁ, সুনির্দিষ্ট যে-মানেটা প্রচলিত, সেটি কখনো-সখনো বদলায়। কিন্তু সে-ও তো আর যা-খুশি মানে-বদল নয়। বাক্যের প্রয়োগের কৌশলে মানেটা বদলে যায়। যেমন 'অজ-আম থেকে শুরু করা' মানে 'একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা' এরকম প্রয়োগে 'অজ' শব্দটার মানে বদলে গেল। কিন্তু সেটি একেবারে কোনো নিয়ম মানেনি তা নয়। বিদ্যাসাগর যদি 'অজ' 'আম' দিয়ে তাঁর বর্ণপরিচয় শুরু না করতেন, অজ শব্দের এমন প্রয়োগ সম্ভব হত না। সুতরাং মানে-বদলেরও একটা নিয়ম রয়েছে। যা-খুশি হয় না। আপনি 'অজ' মানে 'সুন্দরী' ভাবতে পারেন, ঘরে বসে ভাবতে পারেন। কিন্তু জনসমাজে এসে সুন্দরীদের 'অজ' বললে লোকে আপনাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে।

কলিম খান 'অ', 'জ', 'অজ' ও 'ছাগল' নিয়ে বিস্তারিত লিখে এক অবাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি লিখলেন 'শব্দের ভিতরে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু পরম্পরাগতভাবে তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, যা অভিধানে লিখে রাখা থাকে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই অর্থ কখনো-কখনো কিছু-কিছু বদলে যায়—একালের ভাষাতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত'। না কলিম সাহেব, একালের ভাষাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত এমন নয়। আপনি যা লিখেছেন তার শুদ্ধরূপ হবে এমন—'শব্দের ভিতরে কোনো অর্থ নেই, একটি বাক্যে কোনো-একটি শব্দ প্রয়োগের পর বাক্যস্থিত অন্যান্য শব্দের সাথে পরম্পরাগত সম্পর্ক স্থাপন করে শব্দটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। অভিধানে লিখা হয় শব্দের অর্থ-সম্পর্কীয় কিছু প্রাথমিক ধারণামাত্র। একটি বাক্যে যে-শব্দসমূহ থাকে, তার অর্থও ধ্রুবক নয়, দেশকালকে কেন্দ্র করে একধরনের 'মুক্ত-ক্রীড়া (Free play)'-র মাধ্যমে শব্দের অর্থের বিবর্তনও হতে পারে—এই হল একালের ভাষাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত।'

কলিম খান আমাকে আরও বলেছেন : "জনসমাজে এসে সুন্দরীদের 'অজ' বললে লোকে আপনাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে।" শব্দের সম্ভাবনা অসীম, আর তাই আমি ভাবছি অন্যরকম, আমার মনে হয় 'অজ' শব্দটি নিয়ে কলকাতার সুন্দরীদের জন্য আমি যদি কিছু লিখি, তবে তারা আমার প্রেমে পড়ে যাবে। আমি কী লিখব দেখুন :

অজ-চঞ্চল সুন্দরী তুমি, বৃক্ষের কাছে এসো
ফুল-পল্লবে সাজিয়েছি দেহ, বৃক্ষকে ভালোবেসো।

কলিম খান, আপনি বরং কলকাতার সুন্দরীদের সামলান, আমি পাগলা-গারদে যাচ্ছি না। পাগলা-গারদে না গেলেও, আশিক-মাশুক অধ্যায়ে কলিম খান আরও যা লিখেছেন, তা নিয়ে খুব একটা কিছু বলার যে আছে তা নয়। কলিম লিখেছেন: 'মান্যবর মঈন চৌধুরী এসব কথা বুঝবার স্তরে নেই বলেই মনে হয়।' যা ভাষাবিজ্ঞানের স্তরে নেই, তা আমি বুঝতেও চাচ্ছি না, তবে পাঠক কলিম খানের বক্তব্য পড়ে তার স্তরে যেতে পারেন কি না চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

ছয়.

পণ্ডিতে যেখানে পা ফেলতে ভয় পায়...

পণ্ডিতে যেখানে পা ফেলতে ভয় পায়, ঠিক সেই জায়গাতেই পা ফেলেছেন 'মান্যবর মঈন চৌধুরী'—এমন একটা বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন করিম খান এ-অধ্যায়ে। আমি বাংলাভাষার বর্ণমালা স, শ, ষ, ন, ণ ইত্যাদির উচ্চারণ ও বাস্তব ব্যবহার নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। এ-বিষয়ে বাংলাভাষার অনেক জ্ঞানীগুণীজন ও ভাষাবিজ্ঞানীও আমার মতো প্রশ্ন রেখেছেন, কিন্তু ব্যাপারটির সমাধান এখনো হয়নি। কিন্তু কলিম খান বললেন :

এর উত্তরে আমি কী বলব? আমি বললাম—আমাদের বাংলাভাষার শব্দের ভিতরে যে-বর্ণেরা থাকে তারা শব্দটির মানে ধারণ করে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার শব্দের সে-গুণ নেই।... আর, আমার একথা শুনে মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাকে জানতে চাইলেন—'ন' ও 'ণ'-এর উচ্চারণের পার্থক্য কী?! কী উত্তর দেব তাঁকে? বড়োজোর বলতে পারি—চলে যান মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে। যে-কোনো শিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলুন। নিজের কানে শুনেই বুঝতে পারবেন 'ন' আর 'ণ'-এর উচ্চারণের পার্থক্য কী।

এখন আমার প্রশ্ন হল, কলিম-কথিত বাংলাভাষার পঞ্চভুবন থাকতে আমি 'ন' আর 'ণ'-এর উচ্চারণ বুঝতে মহারাষ্ট্র আর মহীশূরে যাব কেন! আমার খুব প্রয়োজন হলে আমি বড়জোর কলকাতা যেতে পারি এবং আমি জানি সেখানে গিয়ে আমি 'স', 'শ' আর 'ষ' নিয়ে আরও ব্যাপক বিভ্রান্তিতে পড়ব, 'ন' আর 'ণ' নিয়ে আমার যে কিছু প্রবলেম আছে, তার সমাধান পাব না।

বাংলা বানানের সমতাবিধান আর বর্ণমালার আধুনিক ব্যবহার নিয়ে একটি নতুন 'বাংলা ব্যাকরণ' রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছিলাম (এমন কথা আরও অনেক জ্ঞানীগুণীজন আমার আগেও বলেছেন)। আমার বক্তব্য শুনে কলিম খান রেগে অস্থির হয়ে লিখলেন :

এরপর তিনি আবার নির্দেশ দিতে লেগেছেন—"আমাদের মুখের ভাষার কাছাকাছি কোনো এক তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে বাংলাভাষার নব্য-ব্যাকরণ রচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে এই নব্য-ব্যাকরণের একটি অংশে অবশ্যই প্রাচীন বাংলাভাষার অনুশাসনমূলক (Prescriptive) বিধান থাকতে পারে, তবে বর্ণনামূলক (Descriptive) অংশটি হবে আমাদের বর্তমানের ভাষা উচ্চারণ ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।"

'... কোনো এক তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে বাংলাভাষার নব্য-ব্যাকরণ রচনা করা'র কথা কে বলতে পারেন? যিনি ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। মান্যবর মঈন চৌধুরীকে বুঝতে হবে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অমন 'তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে' মাত্র দুটি ব্যাকরণ রচিত

হয়েছে—একটি সংস্কৃতভাষা আর একটি গ্রিকভাষার প্রেক্ষিতে। আর যত ব্যাকরণ এ-পর্যন্ত রচিত হয়েছে, সবই ওই দুয়ের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-ক্ষেত্রজ-জারজ-দত্তক ইত্যাদি নানারকমের সন্তান-সন্ততি। ব্যাকরণ রচনার কাজটি যথেষ্ট কঠিন ও মনীষীসুলভ জ্ঞানী মানুষদের কাজ। আর, মান্যবর মঈন চৌধুরী এমনভাবে বলছেন, যেন দোকানে খাট-পালঙ্ক বানানোর অর্ডার দিচ্ছেন।'

আমি বলব, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজের প্রেক্ষাপটে কাজ করে কিছু ব্যক্তিগত দর্শন বা তত্ত্ব। দর্শনহীন তত্ত্বহীন অবস্থায় থেকে কোনো কাজ শুরু করলে তা Nihilism/Anarchism-এর পর্যায়ে চলে যেতে পারে বিধায় আমি বাংলা ব্যাকরণ রচনার আগে একটি ন্যূনতম মাত্রার 'দর্শন-তত্ত্ব' দাঁড় করানোর প্রস্তাব করেছিলাম, আর আমার এ-প্রস্তাবকেই কলিম খান ভাবলেন 'দোকানে গিয়ে খাট-পালঙ্কে'র অর্ডার দেয়া। যাহোক, আমার আগেই এমন 'খাট-পালঙ্কের' অর্ডার অনেক জ্ঞানীগুণীজন দিয়েছেন (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ)। এ মুহূর্তে আমি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি :

"ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিত সাধু বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাঙ্গালা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা সাধু ভাষা হইল বটে ও সর্বতোভাবে প্রাদেশিকত্বরহিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানতঃ উহা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিল।"

"... মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের অভাব দেখিয়া সেই ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। কোন্ ভাষা ভাল, কোন্ ভাষা মন্দ, সে প্রসঙ্গই তাঁহারা উঠান নাই।"

"বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোনখানিও প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাঙ্গালা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই, কোন্ ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও কেহ জানে না। উহা সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত, এ কথার এই অর্থ যে, উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে; উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ।"

"কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গালা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গালার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্য-পরিষদের কার্য; পরিষৎ যদি তাহার কিঞ্চিৎ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন, পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।"

"আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত নিয়ম বর্ত্তমান আছে; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে খুঁজিতে হইবে। সকল ভাষাতেই নিয়ম আছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, লাটিনে, গ্রীকে, ধাঙ্গড়ের ভাষায় ও সাঁওতালের ভাষায় সর্বত্র নিয়ম আছে। কেন না, নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না। নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতে আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা অনেকটা বন্ধনশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা নিয়মবর্জ্জিত? অসম্ভব। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষার মধ্যেও নিয়ম আছে। অন্বেষণ কর, বাহির হইবে।"

উপরিউক্ত 'খাট-পালঙ্ক' তৈরি করার অর্ডার কলিম খান-এর পছন্দ হবে কি না জানি না, তবে আমি (ভাষাতত্ত্ব বুঝি বা না বুঝি) একটি নির্দিষ্ট দর্শন-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন বাংলা ব্যাকরণ রচনা করার পক্ষপাতী (এবং সেখানে কলিম-কথিত 'বিশেষ্যভিত্তিক', 'ক্রিয়াভিত্তিক' বিভাজন রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না)।

সাত.

না-ঘরকা না-ঘাটকা

কলিম খান-কথিত বিশেষ্যভিত্তিক (লোগোসেন্ট্রিক) ও ক্রিয়াভিত্তিক (প্রাচীন) ভাষা-প্রকল্প কখনোই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি (আমি দুঃখিত) এবং আমার মনে হয়েছে কলিম-ব্যবহৃত 'লোগোসেন্ট্রিক' কথাটাই বিভ্রান্তিকর। Logocentrism, logocencentric (শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিকতা, শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিক) হল ভাষাদার্শনিক জাক দেরিদার দর্শনের সাথে জড়িত একটি বিষয়। বিজ্ঞান বলে—আদিতে শব্দময় একক ছিল, প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে সৃষ্টি হল মহাবিশ্বের, আর এই বিষয়ে ধর্মতত্ত্ব বলে—আদি শব্দ-এককের অস্তিত্ব ঐশ্বরিক। ঈশ্বর বলিলেন 'হও' আর তার শব্দ-আদেশেই সৃষ্টি হল মহাবিশ্বের। ভারতীয় দর্শনে দেবী বাক্ বা ধ্বনি-ই একমাত্র আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্ম ও বাক্ এক ও অভিন্ন সত্তা। উপনিষদে বাক্‌রূপ ব্রহ্মাকে আকাশবৎ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্ম, লাতিন verbal logos ও ইংরেজি word শব্দের মূলে অবস্থান করে এক অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম, যা দেরিদার দর্শনে উপস্থিত হয়েছে শব্দব্রহ্মবাদ বা Logocentrism হিসেবে। দেরিদার চিন্তায়, ভাষার শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিক (Logocengrtic) উপাদান হল সবসময়ই অধিবিদ্যাজাত (metaphysical) এবং এই উপাদানে সবসময় Metaphysics of presence কাজ করে। Logocentric বা শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিক ভাষার উপাদান হতে পারে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং যে-কোনো বাক্য। আমি যদি এখন বলি 'ঈশ্বরই সর্বসত্য, তিনি আমাদের স্বর্গ ও শান্তির পথ দেখাবেন', তবে এই বাক্যের বিশেষ্য বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়াসহ পুরোটাই হবে Logocentric বা শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিক। আমরা যদি বলি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কখনোই ভুল কিছু বলতে পারেন না', তবে বাক্যটির 'ক্রিয়াপদ' অংশটাই logocentric হিসেবে বিবেচিত হবে, কারণ 'ভুল বলতে পারেন না'—এমন ক্রিয়াই হল মানুষের জন্য অধিবিদ্যাজাত। কলিম খান জাক দেরিদার 'Logocengric' শব্দটি ধার করে

তার অর্থ বানিয়েছেন 'বিশেষ্যভিত্তিক', যা হয়তো-বা সঠিক নয়। তিনি তার বিশেষ্যভিত্তিককে nominal আর ক্রিয়াভিত্তিককে verbal বলতে পারতেন।

কলিম খান 'না-ঘরকা না ঘাটক' পর্যায়ে এসে আমাকে তার বই পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বলেছেন ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের তত্ত্ব জানার জন্য। বইটি আমি পড়েছি এবং আমার মনে হয়েছে বইটিতে যা লেখা হয়েছে তার ভিত্তি মোটামুটিভাবে অধিতাত্ত্বিক (metaphysical), বাস্তবসম্মত নয়। কলকব্জা, গাড়ি, মেশিন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে re-engineering করা সম্ভব, এমনকি মানুষের হৃৎপিণ্ড, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি re-engineering করে বদলে ফেলা যায়, কিন্তু একটি ভাষা এমনভাবে গতিশীল যে তাকে ধরে re-engineering করা যায় না। যদি কেউ ভাষাকে re-engineering-এর কথা বলেন, তবে তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনা, বাস্তবতাগ্রাহ্য যুক্তি নয়। কলিম খান তার ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন :

সহজ একটি ইংরেজি কথা ধরুন—The sun rises in the east। এই কথাটির বাংলা অনুবাদ আমরা অনায়াসে করে ফেলি 'সূর্য পূর্বদিকে ওঠে'। একইভাবে বাংলা থেকে ইংরেজিও করা হয়। এতে আমাদের কাজ চলে যায়। কিন্তু একটু আঁচালে দেখা যায় এই অনুবাদটি মোটেই সঠিক অনুবাদ নয়। কারণ sun বলতে ইংরেজিভাষী যাকে বোঝায়, আমাদের 'সূর্য্য' ঠিক তাকে বোঝায় না। তপন, আদিত্য, রবি, মরীচিমালী, ভাস্কর, মার্ত্ত , সবিতা, অর্ক, কিরণমালী, অংশুমালী, দিবাকর, দিনকর, দিননাথ, দিনমণি, দিনেশ, দিনেশ্বর, দিবেশ, দিনরাজ, বিবস্বান—সূর্য্যের সমজাতীয় এতগুলি শব্দের একটিরও যথার্থ ইংরেজি প্রতিশব্দ sun নয়। ('তপন' মানে তো 'তাপ দেয় যে'। বাকি শব্দগুলির অর্থও এরকম।) আবার পূর্ব (পূর্ব্ব) কেবলমাত্র east-কেই বোঝায় না, অতীতকেও বোঝায়, প্রাচ্যদেশকেও বোঝায়, বোঝায় যেকোনো previous-কেও। এর মানে ইংরেজি ভাষার শব্দগুলি যেরকম সুনির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) স্বভাবের, আমাদের বাংলাভাষার শব্দগুলি সেরকম নয়। তো, আমরা কী করলাম, সূর্য্যের সমজাতীয় ঐ ২০টি শব্দকেই ফেলে দিয়ে একটিমাত্র শব্দ তৈরি করে নিলাম—য-ফলা বাদে সূর্য, এবং একে sun শব্দের প্রতিশব্দ করে নিলাম। বাংলাভাষার হাজার হাজার শব্দের ক্ষেত্রে এরকম করে ফেললাম আমরা। এরকম করে ফেলায়, যাহোক করে কাজ চালানোর উপায় পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল।

বাংলাভাষার ক্ষতি না করে, কলিম খান-এর ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষা চিন্তা-চেতনায় রেখে সূর্য সম্পর্কে আমরা কেমন বাক্য রচনা করতে পারি (এবং করা উচিত), তার কিছু উদাহরণ আমি লিখছি :

ক. ভোর বেলায় : দিবাকর পূর্ব আকাশে উদিত হয়েছে।
খ. দুপুর বেলায় : তপন প্রচণ্ড তাপ দিচ্ছে, আমার পিপাসা পেয়েছে।
গ. সন্ধ্যা বেলায় : দিননাথ পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গেছে, ঘরে ফিরতে হবে।
ঘ. রাত্রি বেলায় : দিনরাজ এখন কই?

এই যদি হয় ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার রূপ, তবে আমি কলিম খানের কাছে ক্ষমা চাইব, বলব : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও বানান নিয়ে আমরা অনেক ভেজালে আছি, দয়া করে আর বিপদ বাড়াবেন না, আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাভাষাকে নিয়ে 'না-ঘরকা না-ঘাটকা' অবস্থায় থাকতে রাজি আছি। কলিম খান এ-মুহূর্তে আমাকে হয়তো বলবেন—তবে কি তপন, আদিত্য, রবি, মরীচিমালী, ভাস্কর, মার্ত্ত , সবিতা, অর্ক, কিরণমালী, অংশুমালী, দিবাকর, দিনকর, দিননাথ, দিনমনি, দিনেশ, দিনেশ্বর, দিবেশ দিনরাজ, বিবস্বান ইত্যাদি শব্দগুলো বাংলাভাষায় থাকবে না, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবেন? আমার উত্তর হবে, সমার্থবাচক শব্দ হিসেবে সূর্যের বিপরীতে প্রতিটি শব্দই থাকবে, এমনকি সূর্য বানানে যে 'র্য' ব্যবহৃত হত, তার উল্লেখও রাখতে হবে অভিধানে। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক ব্যবহার-সম্পর্কীয় কিছু লিখে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আট.

পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল

বাংলাভাষা কোন ভাষা থেকে এল, এই ভাষার উৎস কোথায়, ভাষার বিবর্তন কিভাবে হল ইত্যাদি বিষয়ে আমি আমার আগের প্রবন্ধে লিখেছি এবং বর্তমানে প্রবন্ধেও অল্পসল্প আলোকপাত করেছি। আমি এখানে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ভাষা-বিষয়ক মন্তব্যগুলো আমার নিজস্ব নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীজনের চিন্তা-ভাবনার ছোটখাট একটা সংকলন ও বিশ্লেষণ ছিল আমার বক্তব্যে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে তাই কলিম খান রচিত 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যতমুষল' আমি বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণীজনকে উৎসর্গ করলাম (কারণ লেখাটি এখন কলিম খানের নয়, পাঠকের এবং আমার সম্পত্তি)। এ-বিষয়ে আমার আর তেমন কিছু বলার নেই।

তবে কলিম খান এ-অধ্যায়ে এসে 'দেহ' ও 'শরীর' নিয়ে কিছু ক্রিয়াভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বিষয়টি মজার, আর তাই বিষয়টা পাঠককে জানাতে চাচ্ছি। কলিম লিখেছেন :

আমাদের দেহটার (body-টার) কথা ধরুন-না কেন। জন্মানোর পর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সে কেবল ভরছে, ভরাট হচ্ছে, বৃদ্ধিলাভ করছে, বাড়ছে; পঞ্চাশের পর থেকে সে আবার উলটো-মুখো, তখন সে ক্রমশ হ্রাস পায়, মেদ-মাংস ঝরতে থাকে, খালি হয়, শীর্ণ হয় এবং একসময় মরে যায়। একে কোন দিক থেকে দেখবেন? পজিটিভ না নেগেটিভ? না, পাশ্চাত্যের হাতে এরকম প্রশ্নের কোনো উত্তরই নেই। উত্তর রয়েছে আমাদের বাংলাভাষীদের হাতে। আমরা, যারা বাংলাভাষায় কথা বলি, তারা উত্তরটি বংশপরম্পরায় জানি। আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন। তাঁরাই মানুষের body-টার দুটো নাম দিয়েছিলেন—'দেহ' ও 'শরীর'। (আর সে-নামটা তাঁরা প্রাকৃত, গৌড়ীয়, না সংস্কৃত, কোন ভাষা থেকে শিখে দিয়েছিলেন, না নিজেরাই দিয়েছিলেন, কে জানে!) যখন ভরাট হচ্ছে, বাড়ছে, বৃদ্ধিলাভ করছে, developing, তখন এর নাম 'দেহ' আর যখন developed এবং শীর্ণ হবার পালা, তখন এর নাম শরীর। তাই, তাঁরা 'দেহ' শব্দটি তৈরি করেছিলেন 'দিহ্' ক্রিয়া থেকে, যার মানে 'বৃদ্ধি পাওয়া', 'বাড়া'।

আর, 'শরীর' শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল 'শৃ' ক্রিয়া দিয়ে, যার মানে শীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ, শরীর হল সেই বস্তু 'যা শীর্ণ হয়'।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাংলাভাষার শব্দের ভিতরে অর্থারোপণ ও অর্থ-নিষ্কাশনের আরও একটি নিয়ম অনুসরণ করতেন। নিয়মটি কেবল আমাদের 'দেহ' ও 'শরীর' এই দুটি শব্দের ক্ষেত্রেই বহমান রয়েছে, তা নয়। আমাদের বাংলাভাষার অধিকাংশ শব্দের ভিতরেই ওই গভীর তত্ত্বটি বহমান রয়েছে, যে-তত্ত্বটি এমনকি পাশ্চাত্যের মহা মহা পণ্ডিতদের হাতেও নেই। অর্থাৎ বাংলাভাষী মাত্রেই অতীব মূল্যবান শব্দাবলি অনায়াসে বহন করে নিয়ে চলেছেন, নিজে তাঁর মানে যথার্থভাবে জানুন, চাই না-জানুন। আর, এই বহনের অভ্যাস বাংলাভাষীদের মনের এত গভীরে প্রোথিত যে, আমরা বাংলাভাষীরা বয়স্ক মানুষকে সাধারণত জানতে চাই 'শরীর কেমন আছে', 'দেহ কেমন আছে' জানতে চাই না।

কলিম খানের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব যদি আবার বাংলাভাষায় চালু হয়ে যায় তবে একজন বয়স্ক লোকের বয়স জেনে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে—'আপনার শরীর কি ভালো?' লোকটির বয়স যদি পঞ্চাশের নিচে হয় তবে তাকে বলতে হবে—'আপনার দেহ কি ভালো আছে?' কিন্তু আমরা মুশকিলে পড়ব মৃতদেহ নিয়ে। যেহেতু মৃতদেহ পচা-গলা ছাড়া বাড়ে না, সেহেতু কি আমাদের মৃত শরীর বলতে হবে? এ-ব্যাপারে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতদের মতামত কী, জানতে ইচ্ছে করছে।

নয়.

মন না চিনে মুড়োয় কেশ

আবহমান পত্রিকার প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় কলিম খান-এর 'আনিলাম অপরিচিতের নাম...' প্রকাশিত হবার পর আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার বন্ধু আজাদুর রহমান মিলে বাংলাদেশের ৬১ জন শিক্ষিত লোকের মাঝে একটি সীমিতমাত্রার জরিপকাজ চালিয়েছিলাম। ৬১ জনের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল :

১। আপনি যখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে ভাষার লিঙ্গান্তর পড়েছেন/শিখেছেন তখন কি আপনার Penis (পুরুষাঙ্গ) ও Vagina (যোনি)-র কথা মনে এসেছে?
২। উচ্চতর ক্লাসে পড়ার সময় এবং বর্তমানে কি পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদ্বয় শুনে Penis আর Vagina-র চিত্র আপনাদের মনে ভেসে ওঠে?

৬১ জনের মাঝে ৬১ জনই আমাদের জানিয়েছেন (শতকরা ১০০ ভাগ) তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় পুরুষাঙ্গ ও যোনি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না, লিঙ্গান্তরকে তারা 'বাবা-মা', 'ভাই-বোন', 'ছেলে-মেয়ে' ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্য হিসেবেই গণ্য করেছেন। উচ্চতর ক্লাসে পড়ার সময় এবং বর্তমানেও তাদের মনে লিঙ্গান্তরের সাথে সাথে Vagina আর Penis চিত্র ভেসে ওঠে না। আমরা যখন জরিপ চালাচ্ছিলাম, তখন দু-একজন আমাদের প্রশ্ন

শুনে কখনো হেসে, আবার কখনো রাগ করে বলেছেন—'ব্যাপার কী চৌধুরী? বয়স বাড়ার সাথে সাথে কি বিকৃতমনা হয়ে যাচ্ছ নাকি?'

কলিম খান কিন্তু তার ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব দিয়ে Penis আর Vagina-র ছবি এনেই ছাড়বেন এবং তিনি লিখলেন :

আমি জানতে চাইব, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদুটি শুনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে যখন Penis ও Vagina-র ছবি ভেসে ওঠে, তখন মান্যবর মঈন চৌধুরীর মনে তেমন ছবি ভেসে ওঠে না কেন? হে পাঠক পাঠিকা, শব্দদুটি শুনে আপনার মনে কীসের ছবি ভেসে ওঠে? নিজের মনকে ভালো করে শুধিয়ে দেখুন। কারণ এর উত্তর থেকে আপনি নিজেই বাংলাভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন।

তার মন্তব্য পড়ার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ হেসেছি। 'বাংলাভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে' penis ও Vagina যে এতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমি আগে বুঝিনি। কিন্তু সবকিছুর পরও আমার মনে দ্বিতীয় একটি চিন্তার জন্ম হয়েছে। আমি ছোটখাট একটা জরিপ করে দেখেছি যে বাংলাদেশের লোকজনের মনে লিঙ্গান্তর কখনোই Penis ও Vagina-র ছবি আনে না। কিন্তু আমি ভাবছি, সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে এমন ছবি হয়তো-বা আসে। ব্যাপারটি যদি এমন হয়, তবে তা রক্ত-মাংসের পুরুষাঙ্গ বা যোনির ছবি নয়, জাক লাঁকা-কথিত Phallus-এর ধারণা হয়তো মনে আসে (শিবলিঙ্গ ও যোনির প্রভাবে) লিঙ্গ-বিভাজক হিসেবে। সমাজ-মনস্তত্ত্ব বা Collective Unconsciousness-এর কারণে এমন হতেই পারে, আর তাই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানার ইচ্ছে রইল।

দশ.

...শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই!

বাংলাভাষা ও বঙ্গাল/বাঙালিদের ঐতিহ্য/ইতিহাস/শিকড় আমি বঙ্গদেশেই খুঁজতে চেয়েছি, আমার চিন্তা-চেতনায় বাংলাভাষার ঐতিহ্যও অবস্থান করছে বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করেই। বঙ্গদেশে আমার যে-আদি পূর্বপুরুষগণ বসবাস করত তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল এবং তাদের ঐ ভাষা দেশকাল গ্রাহ্য করে সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ-বর্জন করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। বাংলাভাষায় সংস্কৃতভাষার অবদান আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কলিম খান আমাকে এক স্বেচ্ছাচারী শক্তির প্রতিনিধি বানিয়ে লিখলেন :

'একক চিন্তাকাঠামো' জিনিসটি কীরূপ? বুশ সাহেব যেরকম সারা পৃথিবীকে 'একক চিন্তাকাঠামো'র ছাঁচে ঢালতে চান, সেরকম? নাকি লাদেন সাহেব যেরকম সারা দুনিয়াকে 'একক চিন্তাকাঠামো'র ছাঁচে ঢালতে চান, সেরকম? না এ-বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা মান্যবর মঈন চৌধুরী আমাদের দেননি। হতে পারে সেটি বুশের, লাদেনের, হিটলারের বা স্টালিনের 'একক চিন্তাকাঠামো'র মতো, আমরা জানি না। কিন্তু এটুকু বোঝা যায়, সেই 'একক চিন্তাকাঠামো'র মানেহল 'যেখানে সব শেয়ালের এক রা' হবে।

আমি বুঝতে পারছি কলিম খান সাহেব চিন্তাকাঠামো বা Paradigm শব্দটির অর্থ বোঝেন না। 'একক চিন্তাকাঠামো' হল 'এক মত' হওয়া থেকে আরও একটু 'বেশি' এবং এই 'বেশি' অংশটায় অবস্থান করছে Socio Linguistics, Phonetics, Social Anthropology,

Social History, Social Philosophy এবং আরও অনেক কিছু। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণীজন যদি 'বাংলা বানান সংস্কার' কিংবা 'বাংলা ব্যাকরণ' রচনার মতো বিশাল কাজ হাতে নিতে চান তবে তাদের শুধুমাত্র 'এক মত' হলে চলবে না। তাদের তৈরি করতে হবে এমন এক যৌক্তিক একক Paradigm, যেখানে কোনো ভিন্নমত অবস্থান করবে না। কলিম খান-এর ইচ্ছেমতো 'সব শেয়ালের এক রা' হওয়াটাই এখানে বাঞ্ছনীয় এবং আমরা কিছুতেই চাইব না সেখানে কোনো এক ব্যাঘ্র এসে অযথা ক্রিয়াভিত্তিক 'হালুম-হুলুম' করুক। আর কলিম যে লাদেন সাহেব, মিস্টার বুশ, হের হিটলার এবং কমরেড স্টালিনের নাম আনলেন, তা হয়তো-বা যৌক্তিক নয়, কারণ কলিমের দেওয়া লিস্ট-এর প্রায় সবাইকে আমি শিয়াল থেকেও নিকৃষ্ট জীব হিসেবে গণ্য করি।

এগার.

ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঝাড়ুদার খুঁজছেন কেন?

ঝাড়ুদারের সঙ্কীর্ণ ব্যাপারটি কলিম খানই তার বক্তব্যে এনেছিলেন। আমি জানি কোনো এক একক ঝাড়ুদার ভাষাকে বা ভাষার শব্দসমূহকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে না। পৃথিবী থেকে অনেক ভাষা বিলীন হয়ে গেছে এ-সত্যও আমার অজানা নয়। ভাষা কিংবা ভাষার শব্দ বিলীন হওয়ার প্রেক্ষাপটে কাজ করে cultural aggression আর cultural imperialism (এ-ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি)। Cultural Aggression যে কী তা কলিম খান কলকাতায় বাবুদের 'সাহেব' হওয়া, রায় সাহেবের 'রয়' বা 'রে' হওয়া, দত্ত বাবুর 'ডাট' বনে যাওয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেনার্জি' হওয়া ইত্যাদি থেকে বুঝতে পারবেন। বর্তমানে বলিউডের অপসংস্কৃতি কলকাতার বাংলাভাষাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, তার হিসেবও কলিম খানকে রাখতে বলব। তবে এ-কথাও সত্য যে ভাষার যে-লৌকিক কাঠামো, সেখানে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকে দেশ ও কাল। দেশ ও কালের হাত থেকে ভাষাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল ভাষার চর্চা, কিন্তু তারপরও ভাষার বিবর্তন চলতেই থাকবে।

বাংলাদেশে মান-ভাষা হিসেবে কলকাতার সাহিত্যের ভাষা এখনো প্রচলিত। কিন্তু দেশ ও কালের প্রভাবে এখনকার মান-ভাষায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ যদি স্থান করে নেয় এবং পদবিন্যাসে (syntax) নতুন মাত্রা আসে, তবে তাকে পজেটিভভাবেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু Cultural Aggression বা Cultural Imperialism-এর ফলে ভাষা যেন বিলীন না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখাটাই বেশি জরুরি। তবে, এ-কথা সত্য যে বাংলাদেশে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ খুব বেশি উজ্জ্বল না হলেও মোটামুটি আলোকিত। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষা নিয়ে আমি কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় আছি (হয়তো এখন কিছুই হবে না, আমার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুটি হল, দেশ-কাল বিবেচনায় আজি হতে শতবর্ষ পরে)। আমি কলিম খানকে বলব, দুই বাংলা একমত হয়ে কীভাবে বাংলাভাষাকে রক্ষা করা যায়, সে-চিন্তাটাই আমরা এখন শুরু করি। আপনার সাথে যে কঠিনতম, কঠিনতর ইত্যাদি ভাষায় তর্ক-বিতর্ক চলছে, এটাও ভাষা-চর্চা ও রক্ষার একটি উপায়।

বার.

স্পেল-চেক বনাম লোকসান চেক

কলিম খান ঠিক কথাই বলেছেন, বাংলাভাষার স্পেল-চেক সফট্অয়ার এখনো ইংরেজি ভাষার সফট্অয়ার-এর মতো কার্যকর ও বাস্তবসম্মত হয়নি, ফলে আমাদের সবাইকে লোকসান গুনতে হচ্ছে। আমি নিজেও প্রকাশনার সাথে জড়িত এবং এ-কারণে ভালো একটি স্পেল-চেক সফট্অয়্যারের আশায় আমি প্রতিদিনই অপেক্ষা করি। কিন্তু আমি বুঝি, ইংরেজি ভাষার স্পেল-চেক সফট্অয়ার মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল সেই বিংশ শতকে ষাট-এর দশকে, IBM 3rd Generation কম্পিউটার আসার সাথে সাথে (আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে)।

বাংলাদেশে প্রথম বাংলাভাষা কম্পোজের সফট্অয়ার তৈরি হয় ১৯৮৩/৮৪ সালের দিকে (পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক পরে) এবং Macintosh কম্পিউটারকেন্দ্রিক ডেস্কটপ পাবলিশিং (ডিটিপি) আমাদের এখানে শুরু হয়েছিল ১৯৮৬/৮৭ সাল নাগাদ। বাংলা স্পেল-চেক সফট্অয়ার ১৯৯৫ সালের দিকে আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু তা এখনো পুরোপুরি কার্যকর নয়। তবু মাত্র ১৫/২০ বছরে বাংলা ডিটিপি যতটা এগিয়েছে, তাতে আমি আশাবাদী এবং আমি ভাবতে পারি আগামী ২/৩ বছরের মাঝে আমরা একটি ভালো স্পেল-চেক সফট্অয়ার পেয়ে যাব, আমাদের লোকসানও কমে যাবে।

তের.

আনিলাম অপরিচিতের নাম...

কলিম খান-এর সাথে আমার মূল বিরোধ ছিল ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক বাংলাভাষা নিয়ে। তিনি যে বাংলাভাষী লোকজনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ করে ফেলবেন, এ-বিষয়টিও আমি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারিনি। চার্বাকের জড়দর্শন, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, বেদান্ত ও বেদান্ত-বৈষ্ণব দর্শন বঙ্গদেশের ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা আমি মানি এবং আমি বিশ্বাস করি, ঠিক একইরকম অবদান রেখেছে পাঠান, মোঘল ও ইংরেজ উপাদানও। কলকাতার বাবু সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, পোশাক-আষাক, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে আমরা ইংরেজ, পাঠান ও মোঘল উপাদানও আবিষ্কার করতে পারব। তবে সবকিছু বিচার, বিশ্লেষণ ও আবিষ্কার করার পরও আমাদের স্বীকার করতে হবে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের, যারা সনাতন যুগের আগেও বঙ্গদেশে কৌমভিত্তিক সমাজ নিয়ে অবস্থান করতেন। একজন কালো আমেরিকান শতকরা একশত ভাগ আমেরিকান হয়েও (ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে) তাদের শিকড়ের খোঁজে আফ্রিকার গ্রাম, গঞ্জ ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। আমরা যারা বাংলাভাষায় কথা বলি, তাদেরও উচিত অযোধ্যা, লঙ্কা, মক্কা, মদিনা বাদ দিয়ে বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদগুলোতে তাদের শিকড়, ইতিহাস, ভাষা ও ঐতিহ্যকে খুঁজে দেখা। বাংলাভাষীদের কেউ যদি 'আর্যতত্ত্বে' বিশ্বাসী থাকেন, তবে তাদের উচিত হবে, তাদের পূর্বপুরুষেরা বঙ্গদেশের যেখানে প্রথম 'গাঁই' বা 'গাঞি' স্থাপন করেছিলেন সেখানেই তাদের শিকড়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা।

কলিম খান মনে হয় ডেভিড বোহ্‌ম-এর Rheomode তত্ত্ব নিয়ে বেশ ভালোভাবেই মোহাচ্ছন্ন, (infatuated)। কথা-কোয়ান্টামতত্ত্ব, কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স, সাইবারনেটিকস্, বস্তুর কণা-তরঙ্গ-রূপ ইত্যাদি মানুষের মনে দর্শন-চিন্তার খোরাক অবশ্যই জোগাতে পারে। আজ থেকে বিশ বছর আগে, ১৯৮৬ সালে আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, ম্যাকস্‌ওয়েল, প্লাঙ্ক, ব্রগলি, শ্রোয়েডিংগার, ম্যাক্স বন, বোহ্‌ম প্রমুখ বিজ্ঞানিদের আবিষ্কার আমার মনেও নতুন দর্শনের উপাদান উপস্থিত করেছিল এবং আমি লিখেছিলাম 'কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাবাদ ও জীবনদর্শন' ও 'সৃষ্টির কণা-তরঙ্গরূপ ও কোয়ান্টাম নন্দনতত্ত্ব' শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটি লিখতে গিয়ে নীল বোর, হাইজেনবার্গ আর ডেভিড বোহ্‌ম-এর মতো আমারও মনে হয়েছিল সৌর-বিশ্বের (macrocosm) লৌকিক ভাষা দিয়ে অণুবিশ্বের (microcosm)-এর ঘটনা প্রকাশ করা সত্যি অসম্ভব। 'আমিই কণা, আমিই তরঙ্গ' কিংবা 'আমার গতিতে আমার অবস্থান নেই'—এমন সব প্রকাশ লৌকিকভাষার প্রেক্ষাপটে ভীষণভাবে অধিতাত্ত্বিক (metaphysical) (উপনিষদ-এ আছে 'যেখানে আলোও নেই অন্ধকারও নেই', কোরানশরীফে আছে—'তারপর হল উনিশ' ইত্যাদি)। অণুবিশ্বের (microcosm)-এর ঘটনা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমাদের নেই এবং এর ফলে এখনো অণুবিশ্বের ঘটনাকে আমরা প্রকাশ করি গণিতে। আমরা বলতে পারি গণিত হল অণুবিশ্ব ও সৌরবিশ্বের একক ও অদ্বিতীয় ভাষা।

বিজ্ঞানী ডেভিড বোহ্‌ম কোয়ান্টাম মেকানিকস্-এ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে তার Bohm-Diffusion, EPR Argument এবং Aharonov-Bohm Effect শিরোনামের কাজগুলোর জন্য তিনি পৃথিবীবিখ্যাত। বোহ্‌ম যখন কোয়ান্টাম মেকানিকস্-বিষয়ক গবেষণায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই তার সাথে পরিচয় হয় জিড্ডো কৃষ্ণমূর্ত্তি-নামক এক ভারতীয় গুরুর, এবং তিনি ভারতীয় অধিবিদ্যা/অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তার গবেষণার বিষয় চযুংরপং-এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় Metaphysics। জিড্ডো কৃষ্ণমূর্ত্তির 'All is one' ধারণার সাথে দার্শনিক হেগেল ও হোয়াইটহেড মিশিয়ে বোহ্‌ম রচনা করেন Wholeness and the Implicate Order (Routledge, London, 1980), Science, Order and Creativity (Routledge, London, 1987) এবং Thought as a System (Routledge, 1999)। এই প্রকাশনাগুলোতে স্থান পায় বোহ্‌মের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব Rheomode এবং সৃষ্টিতত্ত্ব Holomovement। ডেভিড বোহ্‌মের ভাষাতত্ত্ব বা Rheomode-এ যেহেতু অধিবিদ্যাই প্রাধান্য পেয়েছিল এবং Rheomode-এর বাস্তবায়নও যৌক্তিকভাবে সম্ভব ছিল না, সেহেতু বোহ্‌ম-এর ভাষাতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে কখনো আলোচিত হয়নি। এ-ব্যাপারে ডেভিড পিট-এর মন্তব্য :

To this end Bohm developed the notion of a particular language form, the Rheomode, adapted to the discussion of quantum theory and, indeed, to consciousness. It is not clear if Bohm ever considered the Rheomode to have any practical consequences—ie that people would end up speaking it.

ডেভিড বোহ্‌মের অধিবিদ্যা/অতীন্দ্রিয়বাদ বিজ্ঞানী-সমাজে প্রচ ভাবে সমালোচিত হয়। এসময় বোহ্‌ম মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে মানসিক চিকিৎসাও নিতে হয়েছিল। বোহ্‌মের তত্ত্ব সম্পর্কে মার্টিন গার্ডনার বলেন :

Bohm's creative work in physics is undisputable, but in other fields he was almost as gullible as Conan Doyle. He was favorably impressed by Count Alfred Korzybski's Science and Sanity, with the morphogenic fields of Rupert Sheldrake, the orgone energy of Wilhelm Reich, and the marvels of parapsychology. For a while he took seriously Uri Geller's ability to bend keys and spoons, to move compasses, and produce clicks in a Geiger Counter, all with his mind.

Bohm also flirted with panpsychism, the belief that all matter is in some sense alive with low levels of consiousness. "Even the electron is informed with a certain level of mind," Bohm said in an interview published in Quantum Implications : Essays in Honor of David Bohm (1987), edited by Basil Hiley and David Peat. Bohm's later writings swarm with neologisms such as holomovement, rheomode, levate, enfoldment, soma-significant, and implicate and explicate levels of reality.

কলিম খান এক বিতর্কিত Rheomode প্রকল্পকে বাংলাভাষায় কেন প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন তা সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারিনি। আমরা কি আমাদের ভাষা দিয়ে সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব, ক্রিয়া-কর্ম ইত্যাদি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছি না? নাকি আমাদের যোগাযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে আমাদের ভাষার কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে? প্রয়োজন হলে আমি এ-ব্যাপারে আলোচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কলিম খানের সাথে যোগাযোগ করতে পারি এবং তিনি যদি যৌক্তিকভাবে আমাকে ব্যাপারটি বোঝাতে পারেন তবে রবি চক্রবর্তী সাথে আমাকেও তিনি তার সঙ্গী হিসেবে পাবেন (অবশ্য এক্ষেত্রে তাকে ভাবতে হবে যে খুবই অল্পমাত্রায় হলেও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আমার প্রাথমিক ধারণা আছে)।

কলিম খান রচিত প্রথম প্রবন্ধটিকে আমি বলেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের সমালোচনা। ব্যাপারটি হয়তো-বা ছিল আমার বোঝার ভুল কিংবা কলিম খান-এর উপস্থাপনার ত্রুটি। যাহোক, আমার বোঝার ভুল হয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

চৌদ্দ.

পৃথিবী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে

বাংলাভাষা চর্চা করেন এমন জ্ঞানীগুণীজন এবং বাংলাভাষী লোকজন, সবাই চাচ্ছেন ভাষার চর্চা। আজ এই মুহূর্তে, কলিম খান-মঈন চৌধুরী যে-তর্ক-বিতর্ক করছে, তা-ও প্রত্যক্ষভাবে বাংলাভাষার চর্চা ও উন্নয়নকে সহায়তা করবে। বাংলাবানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কিংবা বাংলা ব্যাকরণ রচনার আবশ্যকতা নিয়ে কলিম খান-এর সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই। বিশেষ্যভিত্তিক ও ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা নিয়ে আমাদের মাঝে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি অবশ্যই আছে, বিরোধ আছে আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের উপাদান নিয়ে। এমন বিরোধ আর ভুল-

বোঝাবুঝি থাকাটাই ভাষাচর্চার জন্য ভালো, কারণ আমরা জানি পুকুরের ছোট গণ্ডিতে ঢেউ ওঠে না কিন্তু সমুদ্রে ঢেউ অনিবার্য ।

তথ্যপঞ্জী

১. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কলকাতা ১৪০১
২. আবুল কাসেম, সম্পাদনা, আমাদের ভাষার রূপ, ঢাকা ১৯৬৭
৩. আহমদ শরীফ, বাঙালীত্ব ও সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য ধর্ম, অভিজাত প্রকাশনী, কলিকাতা ২০০৩
৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, কলকাতা ১৩৪১
৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, কলিকাতা ১৩৫৬
৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষা, ভাষা সাহিত্য ধর্ম, অভিজাত প্রকাশনী, কলিকাতা ২০০৩
৭. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, ঢাকা ১৯৯৭
৮. মঈন চৌধুরী, বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ, ঢাকা ২০০০
৯. মঈন চৌধুরী, ইহাশব্দ, ঢাকা ২০০৪
১০. মঈন চৌধুরী, ভাষাভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ : সাহিত্যে তার প্রয়োগ, উলুখাগড়া, ০৬
১১. মঈন চৌধুরী, আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা, সূনৃত, ২০০৬
১২. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টি ও দেশকাল, নিসর্গ, ২০০৬
১৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা—প্রথম খণ্ড , ঢাকা ১৯৫৮
১৪. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভাষা সাহিত্য ধর্ম, অভিজাত প্রকাশনী, কলিকাতা ২০০৩
১৫. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা ১৯৯৪
১৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪
17. Gardner, Martin, David Bohm and Jiddo Krishnomurti, Skeptical Inqurier, 2000
18. Peat, David. Language and Linguistics (http://www.fdavidpeat.com/ideas/langling.htm)
19. Wikipedia, David Bohm, 2006